সানাই

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

পরিবেশক
নাথ ব্রাদার্স ॥ ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ॥ কলকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারী ১৯৬০
মাঘ ১৩৬৭

প্রকাশক
সমীরকুমার নাথ
নাথ পাবলিশিং
২৬ বি পণ্ডিতিয়া প্লেস
কলকাতা ৭০০০২৯

প্রচ্ছদশিল্পী
সুধীর মৈত্র

মুদ্রাকর
সনাতন হাজরা
প্রভাবতী প্রেস
৬৭ শিশির ভাদুড়ী সরণী
কলকাতা ৭০০০০৬

বন্ধুবর গোপালদাকে

॥ সানাই ॥

'খাট এসেছে খাট এসেছে।'

মামা একটা মাছের চপ টেস্ট করছিলেন। আধখানা মুখে, আধখানা প্লেটে ফিকে ধোঁয়া ছাড়ছে। তাড়াতাড়ি দোতলার জানলা দিয়ে মুখ বাড়ালেন। রাস্তায় দুটো বাজখাঁই কুলি। মাথায় ঝকঝকে খোলা খাটের·বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। একজনের হাতে একটা চিরকুট।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ এই বাড়ি। সাতান্ন নম্বর।'

চপের আধখানা মামার গলা দিয়ে ততক্ষণে নেমে গেছে। তিনি ফিনফিনে আর্টিস্টিক গলায় চিৎকার করে বললেন, 'রাস্তায় মাত উতারো। থুতু হ্যায়, গযার হ্যায়। দিনো, দিনো, তোমার খাট এসেছে।' বাবা ভেতরের দিকে ছিলেন। চা তৈরির ডিরেকসান দিচ্ছিলেন, 'যত ভালই চা হোক, তৈরির গুণেই টেস্ট আর ফ্লেভার। পাক্কা পাঁচ মিনিট পটে ভিজবে। নো তাড়াহুড়ো। তাড়াহুড়ো মিনস সব নষ্ট।'

দিনু তখন সিল্ক সিল্ক একটা গেঞ্জি, নতুন একটা দিশী ধুতি পরে, নতুন বউয়ের ঘরে বসেছিল। নিজের বউয়ের একটু ভদাবকি করছিল। আড়ষ্ট ভাবটা কাটানো দরকার। কত বড় একটা দায়িত্ব। পিসতুতো বোন দুটো বড় সন্দেশ আর এক গেলাস জল রেখে গেছে। লজ্জায় হাত ঠেকায়নি। সিঁথিতে এতখানি লাল মেটে সিঁদুর। কপালে চাকা টিপ, চাকাপানা মুখটাকে বেশ ডাঁসাপানা করেছে। ট্যাপোর-টোপোর গালে যৌবন আর স্বাস্থ্যের লাল আভা। লাল শাড়ির ঘোরাল জেল্লা। দিনু মনে মনে তারিফ করছিল, বেশ র‍্যা-ডযেটি. মহিলা। আদুরে আদুরে হবার জন্যে মুখিয়ে আছে।

'সন্দেশ দুটো খেয়ে নাও।'

'ওরে তোর খাট এসেছে।' বাবার গলা।

'হ্যাঁ যাই। খেয়ে নাও, খেয়ে নাও। শোন লজ্জা করো না। আমার মা নেই। তোমাকেই সেই ভ্যাকুয়াম ফিল-আপ করতে হবে।'

দিনু খাট তুলতে চলে গেল। দক্ষিণের ঘরে কোরা সতরঞ্চির ওপর পা মুড়ে নতুন বউ। বসার ধরনটা বেশ জমাটি। সামনের দেয়ালে দিনুর মার প্রমাণ সাইজের যৌবনের ছবি। পরনে বেনারসী, পায়ে ডোরাকাটা পামশু, ব্লাউজে থ্রি-কোয়ার্টার হাতা বউ সেই ছবিটির দিকে এক নিমেষে তাকিয়ে রইল। একটা ধেড়ে মাছি সন্দেশের ওপর ভ্যান ভ্যান করছে। গেলাসের জলে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ধুলো ভাসছে। ছবিতে দিনুর মা, আর সতরঞ্চিতে দিনুর বউয়ের প্রায় একই বয়েস। শাশুড়ী যেন অনেক বেশী সুন্দরী ছিলেন। একটু পাতলা চেহারা কিন্তু বেশ তীক্ষ্ণ। অনেকটা মামাশ্বশুরের মতো। দিনুর বাবা সে তুলনায় অনেক বেশী পুরুষালী। ভীষণ শক্ত-সমর্থ। বাটারফ্লাই গোঁফ, ব্যায়াম করা শরীর। মুখের ভাব বেশ কঠোর আর গম্ভীর। এমন মানুষের সঙ্গে কিভাবে মানিয়ে চলতে হবে জানা নেই। বেশ নার্ভাস লাগছে।

ঘরের বাইরে ভীষণ সোরগোল।

'আহা, আহা বাঁয়া বাঁয়া। দেয়ালে ধাক্কা লাগেগা, পালিশ চট যায়েগা।' মামার গলা।

'সামলে, সামলে, ওরে দিনু মাথা সামলে, হঠাৎ অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেলে ঘরে গেলেই কপালটা দাগবাজি হয়ে যাবে।' বাবার সাবধান-বাণী।

মামা ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'আহা তুমি অত উতলা হচ্ছ কেন, আমরা তো রয়েছি। বাঁয়া বাঁয়া, হাঁ হাঁ, থোড়া বাঁয়া, ক্যারাচে করকে।'

খাট ঢুকছে দিনুর ঘরে। নতুন বউ মাঝারি মাপের ঘোমটা টেনে জুল জুল করে তাকিয়ে আছে। দুটো বিশাল মাপের মানুষ চকচকে খাটের কাঠামো মাথায় ছোট দরজা গলে ঘরে ঢুকতে চাইছে। নতুন ডিসটেম্পার-করা দেওয়ালে সামান্য ধাক্কা লাগলেই চটা উঠে যাবে। পেছনে বিভিন্ন মাপের তিনজন মানুষ। ভয়ঙ্কর শশুরমশাই, ঝকঝকে মামাশ্বশুর আর সদ্য বিয়ে-করা বোকা বোকা স্বামী।

'বউমা একটু উঠতে হবে যে।' মামাশ্বশুরের মিষ্টি অনুরোধের গলা। শুনেছে বড গাইযে। দিনুই বলেছে।

'শুধু উঠলেই হবে না, বেবিযে আসতে হবে। টেমপরাবিলি ঘবটা ছাড়তে হবে।' শ্বশুব মশাইযেব নির্দেশ। গীতা আলতো ভঙ্গিতে সতবঞ্জি থেকে অনেকক্ষণ বসে থাকা অলস শরীরটা তুলতে গেল। এবং পাযেব ধাক্কা লেগে জলভর্তি গেলাসটা উলটে পড়ল। 'এই যাঃ।'

দিনু দবজাব এপাশ থেকে সাবসেব মতো গলাটাকে উঁচকে জিজ্ঞেস কবল, 'কি হল গো।' 'গো' শব্দটা খচ করে কানে লাগল। একদিনেব পক্ষে বড বেশী নৈকট্য। তাডাতাড়ি সামলে নিযে প্রশ্নটাকে আব একবাব বিপিট কবল অন্যভাবে, 'কি হল কী ?'

উত্তব দিল খাট মাথায কুলি, 'পানি গিব গিযা।'

'পানি ? পানি এল কোথা থেকে ?' দিনুব বাবা অবাক হলেন।

দিনু বললে, 'আজ্ঞে খাবাব জল, গেলাসে ছিল।'

'আই সি, আই সি, তা একটু কাজ বেড়ে গেল। জলটা তাহলে মুছে নিতে হয।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ', বলেই দিনু প্রায় হামাগুড়ি দিযে কুলিদেব থামেব মতো পা গলে ঘবে ঢুকে গেল। বেশীব ভাগ জলই সতবঞ্জি শুযে নিয়েছে। বউয়ের শাড়িব তলাব দিকটা সামান্য ভিজেছে। শাডিব ভিজে অংশটা টকটকে লাল। মেঝেতে সরু জলেব ধাবা লতাবেয়া সাপেব মতো ঢালের দিকে একটু একটু কবে গড়িয়ে চলেছে। কি দিযে মোছা যায। হাতেব কাছে কিছু দেখছে না। কোঁচা দিযে কাজটা সারা যায। সদ্য ভাঙা ধবধবে ধুতি। একটু কিন্তু কিন্তু ভাব। দিনু উবু হয়ে বসে আছে বউযেব প্রায পাযেব কাছে। টকটকে আলতা পবা জীবন্ত পা। লক্ষ্মীব পটেই এমন পা এতকাল দেখে এসেছে। দিনুব স্বগতোক্তি, 'কি দিয়ে মুছি।'

দিনুব চেয়ে দিনুব বউয়েব উপস্থিত বুদ্ধি অনেক বেশী। আধভেজা সতবঞ্জিটাব কোণা ধবে একটা ক্লিন সুইপ। জলের ধারা মুছে গেল, সেই সঙ্গে সন্দেশের ডিশটাও গেল উলটে। দুটো কড়া পাক বাতাবি সন্দেশ ক্যাবামের স্ট্রাইকাবের মতো ছিটকে গেল। দিনু নামাজ পড়ার

ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছিল। 'যাঃ গেল!'

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, 'কি গেল রে?'

দিনুকে বলতে হল না, কুলিরাই বলে দিলে, 'মেঠাই উলটলাবা হো।'

'মেঠাই আবার কোথা থেকে এল?'

দিনু বলল, 'ডিশে ছিল।'

কুলিদের তাগাদা, 'হট যাইয়ে বাবুজি।' কথাব সঙ্গে সঙ্গেই অ্যাকশান। ঘরে খাট ঢুকে পড়েছে ধুপধাপ শব্দে। ধুলোমাখা গোদা গোদা পায়ের ছাপ ভিজে মেঝেতে। দিনু দাঁড়িয়ে আছে বউয়ের গা ঘেঁষে। হাতে মেঝে থেকে তুলে নেওয়া সন্দেশ দুটো। বউ ধরে আছে সতরঞ্চিব কান।

মামা মিষ্টি গলায় বললেন, 'তোমবা এবাব সবে পড়। খাটটাকে আমরা ফিট করে ফেলি।'

বাবা বললেন, 'গেলাস আব ডিশটা।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ', দিনুও হেঁট হল, দিনুর বউও হেঁট হল। দুজনেরই টারগেট স্টিলের গেলাস। দিনুর নাকের সঙ্গে বউয়ের মাথাব জোরাল কলিসান। চোখ দিয়ে জল বেবিয়ে এলেও বেশ বোমাঞ্চকর অনুভূতি। হাঁচি পাচ্ছে। কোনও রকমে চাপতে চাপতে ঘব থেকে বেবিয়ে গেল। নাকেব ডগায় লম্বা চুলের সুড়সুড়ি।

'তোমার কি মনে হয় মোহর!' দিনুব বাবা প্রশ্ন করলেন তাঁর শ্যালককে।

'আজ্ঞে খুব উঁচুদরের খাট দিয়েছে বাঁড়ুজ্যেমশাই। কোন সন্দেহ নেই।'

'কে দিয়েছে?'

'আজ্ঞে দিনুর শ্বশুরমশাই।'

'আজ্ঞে নো স্যার। এ খাট দিনুর বাপের পয়সায়। তুমি কি ভাব আমার ছেলে অকশানের মাল। হায়েস্ট বিডারের কাছে ঝেড়ে দিয়েছি! নো স্যার। মেয়েটি ছাড়া কিছুই নিয়নি। আমি তোমাকে খাটের কথা

জিজ্ঞেস করিনি। খাট ইজ এ খাট। নাথিং নিউ। বউমাটিকে আমার কেমন যেন জড়ভট্টি মনে হল।' বেশ জোরে জোরেই কথা হচ্ছে দুজনে। খাট ফিটিংয়ের ঠকাঠক শব্দ হচ্ছে।

শ্যালক বললেন, 'ও জড়ভট্টি। না না, তেমন কিছু নয়। নতুন তো তাই একটু পায়ে পায়ে জড়িয়ে যাচ্ছে। মেয়েটির অ্যাপিয়ারেন্স কিন্তু ভাল। বেশ মনোবম।'

'অল দ্যাট গ্লিটারস ইজ নট গোল্ড, বুঝলে মোহর। প্রথম থেকেই যদি ঘবের কোণে গ্যাঁট হয়ে বসে থাকার হ্যাবিট গ্রো করে যায় তা হলেই মহামুশকিল। দেখা যাক কি হয়। সবই ভাগ্য বুঝলে মোহর। বিবাহ হল অ্যালয়, তিন ভাগ তামা আর এক ভাগ দস্তা মিলেমিশে ভরনের কাঁসা'। তিন ভাগ স্বামী আব এক ভাগ স্ত্রী তবেই না সুখের সংসাব, শান্তিব সংসার। যে সংসারে স্ত্রীব দাপট বেশী সে সংসার জানবে ট্রয়েব যুদ্ধ।'

'কিন্তু একদিনেই কোন মারাত্মক সিদ্ধান্তে আসা কি ঠিক হবে?'

'অফকোর্স নট, তবে মুখ চোখে কেমন যেন একটা অহঙ্কারীব ভাব। যাক ফিউচার লাইফ ইন দি উম্ব অব টাইম, মহাকালই জানেন কি হবে। খাটটার প্লেসিং ঠিক হল? মাথা কি উত্তবের দিকে হবে?'

'আজ্ঞে না, উত্তরে মাথা করা ঠিক হবে না, ভারতেব উত্তবে হিমালয়, মহাপ্রস্থানের দিক।'

'দ্যাটস রাইট। তবে ঘোবাতে বল। দক্ষিণে মাথা, উত্তরে পা।'

মামা সঙ্গে সঙ্গে হুকুম জারি কবলেন, 'ঘিঁচো, উসকো ঘিঁচো।'

খাট টানাটানির মাঝেই আবার বাইরে সোরগোল, 'সানাই এসেছে, সানাই।'

'মোহর, সানাই তোমার ডিপার্টমেন্ট। একটু পরেই আমি সব দপ্তর বণ্টন কবে দোব। তোমার হবে সানাই, অভ্যাগতদের অভ্যর্থনা, আর্টিস্টিক ব্যাপার সব তোমার। ওস্তাদের নামটা যেন কি?'

'আজ্ঞে বানারসের ছোটে মিঞা, বহুত নামজাদা ঘরানা।'

'থেঁন ইউ গো। একেবারে আসরে বসিয়ে দাও। সকালটা তো

চল্লেই গেল। তবিয়ত যদি ঠিক থাকে ওস্তাদজীকে বল বৃন্দাবনী সারঙ্গে একটু ছাড়তে। অ্যাটমসফিয়ারটা একটু জমে যাক। ওয়ানস ইন এ লাইফটাইম এই সব অকেসান আসে।'

'রামকেলী কিংবা মাড়োয়াও চলতে পারে।'

'মাড়োয়াও পারে তবে রামকেলীটা চালাতে হলে গায়েব জোবে। তুমি ওদিক থেকে দিনুটাকে একটু খুঁচিয়ে এদিকে পাঠাতে পারবে?'

'আজ্ঞে এসে গেছি।' দরজাব সামনে দিনু, 'ইলেকট্রিসিযানও এসে গেছেন কোথায় কি পয়েণ্ট হবে· ·।'

'পয়েণ্ট। চতুর্দিকে পয়েণ্ট হবে। তুমি ওপবেব প্যাণ্ডেল থেকে স্টার্ট কব। আগে ফিউজটা দেখে নাও, একস্ট্রা লোড টানতে পারবে কিনা! ফিউজ বাক্সটা দেখিয়ে দাও দিনু।'

'দেখাতে হবে না, আমি জানি।'

'ভেবি গুড। তাহলে লেগে পড।'

কুলিবা খাট ফিট কবে ছতবিমতরি সব লাগিযে দিয়েছে। এইবাব চালান সই, বকশিশ, ভাডা দেবাব পালা।

'কুছ মিঠাই উঠাই নেহি মিলেগা বাবু?'

'জরুব মিলেগা। দিনু তুমি এদেব গণেশকাকাবাবুব জিম্মা করে দিয়ে এস, যাবে আব আসবে। আটকে থেক না। থাউজেণ্ড অ্যাণ্ড ওয়ান কাজ।'

বাবাব প্রাণেব বন্ধু গণেশ চট্টোপাধ্যায়, ভিয়েনেব সামনে চেয়ার পেতে বসে আছেন। মুখে সিগাবেট। কোলেব ওপব সেদিনের খবরের কাগজ। বিশাল কড়ায় ছ্যাঁচডা চেপেছে। দুজন যোগাড়ের একজন হামানদিস্তেতে মশলা ঠুকছে ঠ্যাং ঠ্যাং করে। আব একজন উবু হয়ে বসে প্লাস্টিক চাটনির পেঁপে কুটছে ফিনফিনে সরু করে। হালুইকরেব নাম অনন্ত। নামজাদা রাঁধিয়ে। হাতিবাগানের কাছে ডেরা। জজ, মেজিস্ট্রেটের বাড়িতে বড় বড় কাজে রেঁধে রেঁধে হাত পাকিয়েছে। মুখের হাসিতে বিনয়ীগুমোর চুঁইয়ে পড়ছে। নৌকোর হাল চালাবার মতো করে কড়ায় খুন্তি চালাচ্ছে আর সমানে বকবক

করে চলেছে। বুকের কাছে গেঞ্জির ওপর হলদে মতো পৈতের একটা অংশ ব্রাহ্মণত্বের বিজ্ঞাপন হয়ে লতরপতর করছে।

দিনু কুলি দুজনকে গণেশকাকার হেপাজতে রেখে চলে আসছিল। হঠাৎ তাব চোখ পড়ল ছাদের আর এক অংশে। সেদিকটা ঘেরা হয়নি। সব কটা ফুলগাছের টব একসঙ্গে জলসায় বসেছে যেন। কিছু ফুটন্ত চন্দ্রমল্লিকা, গোটাকতক বাজখাই সাইজেব ডালিয়া। তারই পাশে উদাসী দিনুর বউ। গণেশকাকা নিজেব খেয়ালেই আছেন। ভিয়েনের ইনচার্জ। বালিগঞ্জে বাড়ি। একমাথা অতৈলাক্ত ফরফরে চুল। যে কাজেব ভাব পেয়েছেন সেই কাজেই মশগুল। দিনু যদি একবার বউযেব কাছে চক্কব মেবে আসে খেয়াল কববেন বলে মনে হয় না। কবলেও কিছু ভেবে বসবেন না। পিতৃবন্ধু হলেও বেশ মাইডিয়াব লিবাবেল মানুষ।

দিনু আস্তে আস্তে বউয়েব পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। ঘাড়ের কাছে বিয়ের বাতেব খোঁপাটাই নেতিযে আছে। একটু বাসি হয়ে যেন আরও সুস্বাদু হয়েছে। ভিকাট ব্লাউজ থেকে পিঠের আর কাঁধের বেশ খানিকটা মসৃণ অংশ বেরিযে আছে। একটা কটা তিল। শাড়ি, কোমর, নিতম্ব একটা ছন্দের মতো, দ্বিপ্রহরের কবিতা। হাতের একটা আঙুল দিয়ে ঘাডেব কাছে স্পর্শ করতেই পঁ্যা করে সানাই বেজে উঠল। দিনু চমকে উঠল। বউ চমকে ফিরে তাকিয়েছে। দু চোখে টলটলে জল। বড় বড় চোখেব পাতা ভিজে। সানাই কথা বলার সুবিধে করে দিয়েছে। গণেশকাকা আড়ালে। একজন যোগাড়ের পিঠটা দেখা যাচ্ছে।

'তুমি কাঁদছ ?'

আঁচলে চোখ মুছে বউ বলল, 'কই না তো।'

'কাঁদছ কেন ? মন খাবাপ !'

'কই না তো !'

'নীচে চল। একলা একলা দাঁড়াতে হবে না, চল নীচে চল'। দিনুর মনে হল হঠাৎ তার গলায় এক ধরনেব আদেশের সুর এসে গেছে।

এতদিন সে সকলের আদেশ শুনে এসেছে। আজ এক নতুন অভিজ্ঞতা। স্নেহমিশ্রিত আদেশ।

বউ ম্লান হেসে বললে, 'আপনি, না তুমি, তুমি নেমে যাও, আমি আসছি।

'ঠিক ?'

'ঠিক।'

'তুমি ওদের সঙ্গে একটু মেশ না। পানটান সাজছে। কত কি কাজ রয়েছে।'

'যাচ্ছি। তুমি যাও।'

দিনু গুটিগুটি ছাদ থেকে নেমে এল। দক্ষিণেব ঘবে তখন খাটপর্ব আরও এক ধাপ এগিয়েছে। কাঠেব ওপর নতুন একটা সতরঞ্চি পড়েছে। বাবা বললেন, 'যাও ও-ঘর থেকে ধরাধবি করে তোশকটা নিয়ে এস। একলা চেষ্টা করো না। ভেবি হেভি। ঘাড়ে ঠিক ব্যথা লেগে যাবে।'

দিনুরও খুব লজ্জা কবছিল। গুরুজন মানুষ। এইভাবে তাদের ফুলশয্যার খাট বিছানা ঠিক কববেন। কি ? না বাতে ছেলে আর ছেলের বউ জড়াজড়ি কবে শোবে। বিয়ে করে দিনু এমনিই মরমে মবে আছে। কেমন যেন পাপী-পাপী লাগছে। ব্যভিচারের লাইসেনস হাতে এসেছে। ছিল একা। বাবার নেওটা। এখন দোকা। মসৃণ একটি যুবতির স্বত্বাধিকাবী। এতকাল বাবাব বিছানায় বাবাব কাছে শুয়ে এসেছে। আজ শুতে হবে প্রায় অচেনা একটি মেয়ের পাশে। সানাই তখন মাঝরাতে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে দরবারি ছাড়বে। নিমন্ত্রিতদের শেষ ব্যাচ ততক্ষণে চ্যাকোব-চোকোর করে পান চিবোতে চিবোতে বাড়ি পৌঁছে যাবে ভাবা যায় না। তবু ভাবতে হচ্ছে। দিনু একটু প্রতিবাদের গলায় বললে, 'এবার আমরাই সব করে নিচ্ছি, বাবা।'

'আমরা ! হোয়াট ডু ইউ মিন বাই আমরা। তুমি আব আমি এই দুজনে মিলেই তো আমরা। যাও, ডোণ্ট ওয়েস্ট টাইম। আহা, বেড়ে বাজাচ্ছে !'

উত্তরে বারান্দার ধারে কলের পাশে উবু হয়ে নিরঞ্জন সোডা দিয়ে

দু ডজন কাঁচের গেলাস ধুচ্ছিল। দিনু বললে, 'হেল্প। দুটো হাতই ভেজা। ওপর হাত দিয়ে কপালের ধারে ঝুলেপড়া চুল ঠিক করতে করতে নিরঞ্জন বললে, 'কি ধবনের হেল্প, ঝুল ঝাড়া?'

'তার চেয়েও মারাত্মক, বিছানা বওয়া।'

'এখন আবার কে শোবে?'

'এখন নয়, রাতেব জন্যে রেডি করা হচ্ছে।'

'বাত এখনও অনেক দূরে, একটু পরে হবে।'

'ছোটবাবু ওয়েট করছেন। তুমি না পাবলে অন্য কারোকে ধরতে হবে।'

'ওরে বাবা, কুরুক্ষেত্র হো যায়ে গা।'

স্টোবরুমে বিছানাপত্তব সব লটঘট হয়ে পড়েছিল। নিরঞ্জন একাই একশ। গন্ধমাদন ঘাডে কবে দক্ষিণের ঘবে লাফিয়ে পড়ল। দিনু দর্শক। দিনুব বাবা আর নিরঞ্জন দুজনে ধস্তাধস্তি। নিরঞ্জন মোটা তোশকটা খাটের মাঝখানে বোলকরা অবস্থায় পাতলা সতরঞ্জির ওপর ফেলে একটা পাশ খুলেছে। নিরঞ্জন খাটিয়ে তবে সব কাজই একটু ধুমধাডাক্কা গোছেব। যে পাশটা খুলেছে সে পাশটার ভাঁজ ছোট। খাটের সমান সমান হয়নি। হিড়হিড় করে টান। সতরঞ্জি-মতবঞ্জি গুটিয়ে পাকিয়ে একাক্কার। দিনুর বাবা চটে উঠলেন, 'তোব এই ইডিয়টিক কাজকর্ম দেখলে আমার বাইলস ঠিক থাকে না নিরঞ্জন।'

নিরঞ্জন বোকাব মতো মুখ কবে বললে, 'আপনার তো পাইলস ছিল না ছোটবাবু! এবার দেশে গেলে পাইলসের মাদুলি এনে দেব, সেরে যাবে।'

'আ, মূর্খ, কোথায় বাইলস আর কোথায় পাইলস! পনেরটা অ্যালফাবেট টপকে জাম্প করে বি থেকে পিতে চলে গেলি! ধডফড়ে স্বভাব যাবে কোথায়। বাইলস মানে পিত্তি। তোর কাজকর্ম দেখলে আমার পিত্তি চটে যায়।'

'আজ্ঞে ধনেপলতা।'

'নামা ইডিয়েট নামা। সব নামা। আবার বিগিন ফ্রম দি বিগিনিং।'

সানাই পিলুতে ঠুমরি ধরেছে। দাদরয়া বলে মোরা সোর। সমের মাথায় দিন্নুর বাবা হাঁ করে একটা শব্দ করে বললেন, 'আহা জমিয়ে দিয়েছে।'

নিরঞ্জন সঙ্গে সঙ্গে বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ! তুই গানের কি বুঝিস রাসকেল!'

'ছেলেবেলায় অনেক যাত্রা দেখেছি যে ছোটবাবু।'

'বেশ করেছিস। এখন বকবক করে সময় নষ্ট না করে সতরঞ্চিটা আবার সমান করে পাত।'

'তা পাতছি, তবে থাকবে না, আবার গুটিয়ে যাবে।'

'আলবত থাকবে। সব কিছুর একটা সায়েন্স আছে।'

'সে আবার কি?'

'সে বোঝার ক্ষমতা থাকলে তুই নিরঞ্জন হবি কেন আর আমি তোর ছোটবাবু হব কেন?'

'আজ্ঞে তা ঠিক।'

দিন্নু আর নিরঞ্জন দুদিক থেকে সতরঞ্চিটাকে ধরে টান টান করে পাতল।

'পেতেছি ছোটবাবু।'

'বেশ করেছিস। এবার আয়, তোশকটাকে দুজনে দুদিক থেকে ধরে স্ট্রেট নামিয়ে দি, নো টানাটানি। যাকে বলে প্যারাচুট ড্রপিং।'

'সে আবার কি!'

'ও হল যুদ্ধের ব্যাপার, তুই বুঝবি না, যা বলি তাই কর। তোশকটা খোল, চাদর পাতার মতো পাততে হবে।'

'তোশক আর চাদর এক হল? তোশক কত ভারী! আপনার না সাইটিকা আছে, এখুনি কোমরে লেগে যাবে খচ করে।'

'সাইটিকা যেমন আছে তুইও তো তেমনি আছিস, দুরমুশ করে দিবি।'

'আজ কাজের বাড়ি দুরমুশ হবে কি করে!'

'আজ তো রাতে ঘুম নেই। যন্ত্রণা হলে জেগে বসে থাকতে হয়,

আজ তো এমনিই বসে থাকতে হবে। তবে উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ।'

'আজ্ঞে কোমর যদি বেঁকে যায় গোবিন্দর বাপের ক্ষমতা কি সোজা করে!'

'তুই গোবিন্দর বাপ তুললি এবপর তো দিনুর বাপকে তুলবি রাসকেল।'

'ছি বাবু, ওটা হল কথাব কথা।'

'নে, ধব।'

'পাববেন না বাবু। বেজায ভাবী।'

'ভীমচন্দ্রকে স্মবণ কব। বল্ ভীমায নমঃ।'

'একবাব কেন একশবাব বলছি কিন্তু মহাভারতের যুগ কি আব ফিবে আসবে ছোটবাবু।'

'খুব আসবে, ইফ দুর্যোধন অ্যাণ্ড দুঃশাসনস ক্যান কাম ভীমসেন মাস্ট টার্ন আপ।'

'মালা এসেছে, ফুল এসেছে, ছোটমামা কোথায়, ছোটমামা।' দিনুর বড় পিসতুতো বোন ছোটমামা ছোটমামা কবতে কবতে দরজার সামনে দর্শন দিল। চেহাবাটি ভাল। এখনও কিন্তু পাত্র জোটেনি। চাঁদের আলোয নির্জন ছাদে দাঁড়িযে একদিন দিনুকে চকাম কবে চুমু খেয়ে বলেছিল, 'তোর মুখটা ভাবি মিষ্টি। চবাচব ভেসে গেছে চন্দ্রালোকে। কোথাও একটা কোকিল ডাকছে। গালেব ভিজে ভিজে জায়গাটায় দিনু হাত বুলোচ্ছে। সেই দৃশ্যটা দিনুব কেবলই মনে পড়ে। সেই নরম অনুভূতিটা ফিবে আসে বাবে বাবে।

'কটা মালা এসেছে গুণেছিস?' দিনুর বাবা প্রশ্ন করলেন।

'না তো ছোটমামা।'

'এক ডজন গোড়েব মালা আছে কিনা দেখ্।'

'আপনি একবার চলুন না।'

'বিছানা!'

'আমবা আছি তো!'

নিবঞ্জন যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল, 'হ্যাঁ বাবু আপনি যান,,

আমরা আছি তো।'

গোড়ের মালা এসেছে। নতুন বউকে সাজাবার ফুলের গহনা এসেছে। চূড়, বাজু, মালা। সরু তার দিয়ে পাকানো পাকানো। দিনুব বাবা দিনুব মামাকে বললেন, 'মোহব, এ তো বড় বিপজ্জনক জিনিস হে! বউমাকে পরাবে বটে তবে রক্তাবক্তি হয়ে ধনুষ্টঙ্কাব না হয়ে যায়! একটা ইঞ্জেকসান দিয়ে দিতে পাবলে ভাল হত।'

'মেয়েবা একটা দিন এসব পরেই থাকে, ভয়ের কিছুই নেই।'

'কিন্তু এই শীতকালে সাবা গায়ে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ফুল জড়িযে ঠায় ঘণ্টা চারেক বসে থাকাও একটা পানিশমেণ্ট হে। বিবাহ মাথায় থাক!'

'আজ্ঞে বিবাহ জিনিসটাই তো এক ধরনেব শাস্তি। তবু আনন্দেব।'

'যাক মেয়েদেব ব্যাপাব মেয়েবাই বুঝবে, আমাব বারটা মালা আমি তুলে নিয়ে সবে পড়ি। ও হো, একটা ভুল হযে গেল হে।'

'কি ভুল?'

'তোমাব ওই ওস্তাদদেব একটা কবে মালা দেওয়া উচিত তবেই না বাজাবাব মেজাজ আসবে।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ তা ঠিক, তবে ভুল যখন হয়েই গেছে তখন তো আব উপায নেই। মালা ছাড়াই সানাই বাজবে। মালাটা তো আর এসেনসিযাল নয়।'

'কিচ্ছু ভেবো না মোহব, সব ভুলেরই সংশোধন আছে। নিবঞ্জন! নি-র-ঞ্জ-ন!'

ছোটবাবুর তীক্ষ্ণ ডাক নিরঞ্জনের কানে গেছে। তোশক পাততে গিয়ে সতরঞ্জিটা কুঁচকেছে কিনা দেখাব জন্যে সে খাটেব তলায় চিত হয়ে শুয়েছিল অনেকটা গাড়ি মেবামতেব কায়দায়—'আজ্ঞে যাই ছোটবাবু।' তেলা মেঝে। হড়কে বেরিয়ে এল সটান।

'নিরঞ্জন আর ইউ ডেড!'

নিরঞ্জন একলাফে ছোটবাবুর সামনে এসে বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু।'

'হ্যাঁ বাবু! ডেড মানে কি?'

'জানি না তো।'

'না জেনে সব কথায় হ্যাঁ বলিস কেন? সোজা বাজার। তিনটে মালা। বেস্ট মালা কিনবি।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আবার হ্যাঁ।'

'আজ্ঞে না।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। বেস্ট মানে কি?'

'মুখ্য বাবু, ইংরিজীর মানে সব কি জানি?' নিরঞ্জন সকলের মুখের দিকে তাকাল।

'বেস্ট মানে সেরা।'

'আজ্ঞে সেটা যেন আন্দাজ করেছি।'

'গুড। পৃথিবীর সব কিছুই কমনসেন্স দিয়ে বোঝা যায়, পণ্ডিত হবার প্রয়োজন হয় না। যাবি আর আসবি। হাঁ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাক দেখ না।'

হাঁটুর ওপর তোলা ধুতিটাকে নামিয়ে দিয়ে শরীরের ধুলোটুলো ঝেড়ে ওরই মধ্যে একটু ফিটফাট হয়ে নিরঞ্জন ঘোঁত ঘোঁত করে সদরের দিকে দৌড়ল। দিনুর বাবা শ্যালকের দিকে তাকিয়ে হাসি হাসি মুখে বললেন, 'সংসারের অ্যাসেট মাথায় করে রেখেছে। এ সব মানুষ দুর্লভ।' হাতে বাবোটা রজনীগন্ধার গোড়ের মালা। শরীরের চারপাশ বেয়ে ঝুলছে, সারা মুখে একটা তৃপ্তির হাসি। বাবাকে খুশি দেখে দিনুর বেশ লাগছিল। ভেতরের মানুষটি নরম কদাচিৎ এইভাবে বেরিয়ে আসে। সারা সংসারটা তখন হেসে ওঠে। দিনুকে পাশে পেয়ে দিনুর বাবা যেন হালে পানি পেলেন। সংসারে তো দুটি মাত্র মানুষ। দিনু আর তিনি নিজে। নিরঞ্জনকে ধরলে, ধরলে কেন ধরতেই হবে, সে বেচারা সব ছেড়ে এখানেই জড়িয়ে পড়েছে, সংখ্যা দাঁড়ায় তিন। বউমা আসায় চার। আত্মীয়স্বজন আজ যাঁরা এসে বাড়ি গমগম করে তুলেছেন তাঁরা তো সব ক্ষণিকের অতিথি। সুখটি নিয়েই সরে পড়বেন। দুঃখে সুখে এই কজন মানুষই সাতান্ন নম্বর বাড়ির প্রধান চরিত্র।

'এই নাও মালা। আজ শুভদিন নিজে হাতে পরাবে।'

কাকে পরাবে? বউকে? ভেবেই চোখে একটা লাজুক দৃষ্টি নেমে এল। হাত বাড়িয়ে মালাগুলো নিল।

'একটা তোমার মাব ছবিতে, একটা জ্যাঠাইমাব ছবিতে, একটা জ্যাঠামশাইযেব ছবিতে, পবলোকগত যাঁদের যাঁদেব ছবি আছে সব ছবিতে একটা কবে। ঠাকুর্দাব ছবি অনেক উঁচুতে। টেবিলের ওপব চেয়াব বেখে উঠতে হবে। চেষ্টা কবো না। বেখে দাও। ওটা আমার কাজ। চান কবে এসে ঠাকুব আর ঠাকুর্দাব গলায় আমি পবাব। বিছানা পর্ব কতদূব?'

'আজ্ঞে হয়ে গেছে।'

'তাহলে মোহর, উই হ্যাভ আর্নড এ কাপ অফ টি। একটু চাযেব ব্যবস্থা দেখ।'

'ঠিক বলেছেন, ভেতবটা সত্যিই চা চা কবছে।'

'কবতেই হবে, শালা ভগ্নীপতিব এক ধাত। তা ছাড়া জানবে, উৎসবে ব্যসনে একমাত্র উৎসাহদাতা চা। কিন্তু কে কববে?'

'কবাব জন্যে ভাবছেন! ও তো লাগাতাব হযেই চলেছে। শুধু হুকুমেব মামলা। চা দপ্তবে শুধু বললেই হল।'

'তা হলে বলে ফেল।'

দিনুর বড পিসতুতো বোন বেখা চায়েব চার্জে মামা হেঁকে বললেন, রেখা, বেখা, দু কাপ কড়া জিনিস এদিকে ছেড়ো।'

উত্তর দিক থেকে উত্তব এল, 'আচ্ছা মামা।'

উত্তব দিকটা আপাতত মেযে মহল। ক্যাচরম্যাচব কথার খই ফুটছে। মাঝেমধ্যে হাসিব শব্দ। অন্য সময় হলে নাবীদেব উচ্চকণ্ঠ দিনুর বাবা এক দাবড়ানিতে শেষ করে দিতেন। আজ শুধু বললেন, 'আইডিয়েল হিন্দু বিবাহেব আটমসফিয়াবটা ঠিক জমেছে।'

সানাই পোঁ ধরেছে, এইবাব কোনও রাগ বেজে উঠবে। ওস্তাদজী দম নিচ্ছেন। মেয়ে মহলে হঠাৎ খিলখিল হাসি উঠল, অনেকটা হাওয়ায় দুলে ওঠা ঝাড়লণ্ঠনের শব্দের মতো। দিনুর বাবা অবাক হয়ে

উত্তরের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, 'মেয়েছেলে জাতটাই অদ্ভুত হে মোহর, যেমন কাঁদতে পারে তেমনি হাসতে পারে, যেমন রাগতে পারে তেমনি বাগাতে পারে।'

দিনুব বউ চা নিয়ে আসছে গুটি গুটি পায়ে। দেখলেই হাসি পায়। যেন দম দেওয়া পুতুল! মাথায় সামান্য ঘোমটা। খুলে যাবার ভয়ে একটা পাশ ঠোঁটের ক্লিপে আটকানো। লালের ঘেবাটোপে ধবধবে ফর্সা মুখ।

'বাবা, চা।' হাতটা দিনুব বাবার দিকে উঠল। একটু যেন কাঁপছে। বাবার নজব এড়াল না। বউ 'বাবা' বলছে, দিনুব কি আনন্দ! এতদিনে বাবাকে বাবা বলার তুজন লোক হল সংসারে।

দিনুর বাবা চায়ের কাপটা নিতে নিতে বললেন, 'হোযাই সো শেকি! আমাকে অত ভযেব কি আছে মা! বাঘ না ভাল্লুক! মিশে দেখ, মানুষটা তত খাবাপ নয। তবে হ্যাঁ, লোকে বলে ধাতটা একটু কড়া। সব সময় গম্ভীব। কিন্তু মা, তুমি যদি জানতে, একের পর এক কত ধাক্কা, মৃত্যুর মিছিল চলে গেছে জীবনের ওপর দিযে। হাসব কি কবে! একসময সব ছিল, জমজমাট সংসাব। এখন আমবা মাত্র তুটি প্রাণী টিমটম করছি। এইবাব তুমি এলে। মোহব!'

'আজ্ঞে!'

'সেই গানটা, শূন্য এ বুকে পাখি মোর ফিরে আয় ফিরে আয়।'

'জ্ঞান গোঁসাই।'

'ছাটস বাইট। বাত্তিবে তোমার গলায় গানটা শুনতে চাই।'

দিনুব বউ ধীবে ধীরে পেছু হটে হটে সরে পড়াব তালে ছিল। মেয়ে মহলের অনেক তালিমের পব ভয়ে ভয়ে চা দিতে এসেছিল। একটু আগেব হাসির কারণ ছিল সেইটাই। দিনুর পিসতুতো বোন শেখাচ্ছিল, বলবে, 'বাবা এই নিন চা।' বউ বলছিল, 'শুধু দিয়ে এলেই তো হল, আবার বাবা বলতে হবে?'

'তা হবে না! বাবাকে বাবাই তো বলতে হবে, না শ্বশুবমশাই বলবে?'

'কিছুই বলব না, দিয়েই পালিয়ে আসব।'

'তা কি হয় বাছা! বলতে হবে বাবা চা কিংবা চা বাবা।'

দিনুর বউ আবৃত্তি করতে লাগল, 'চা বাবা, বাবা চা, চা বাবা…'

দিনুর বাবা চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, 'আহা ফাসক্লাস। তুমি পালাচ্ছ কেন মা। আরে বোকা, সংসাবটা তো তোমার। যত তাড়া-তাড়ি সহজ হতে পার ততই তো ভাল। আচ্ছা আচ্ছা, ধীরে ধীবে হবে। পেছু হটে নয়। সামনে তাকিয়ে, বুক ফুলিয়ে, মাথা উঁচু করে যাও।'

দিনু মায়ের ছবিতে ফুলের মালাটা পরিয়ে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। ছেঁড়া ছেঁড়া অস্পষ্ট স্মৃতি। মনে পড়ে কি পড়ে না। 'তুমি খুব স্বার্থপর মা। কেমন ফেলে পালালে। সব ফাঁকা করে ধীরে ধীরে আবার জমজমাট। এ যেন নীলকণ্ঠের গানের সেই লাইনটা, এক কূল নদী ভাঙে নিববধি আবার অন্য কূলে আকূলে সাজায়। কেন নেই! আজ কেন তুমি নেই? আমার শৈশবটাকে মরুভূমি করে দিয়ে কেমন সট করে কেটে গেলে! মা আমার একটা বউ এসেছে, একটা বউ। দুজনে মা মা করে ডাকতুম, কেমন মজা হত…।' দিনুর চোখ ছাপিয়ে জল এসে গেল। ভাবটা চটকে দিলে দিনুব পিসতুতো বোন।

'তোর কাছে অ্যানাসিন কিংবা সাবিডন আছে রে?'

দিনু চোখ মুছে ধরা-ধরা গলায় বললে, 'কেন, কে খাবে?'

'তুই একা একা মাইমার ছবির সামনে দাঁড়িয়ে কাঁদছিস? উৎসবের দিনে চোখে জল!' আঁচল খুলে চোখের জল মোছাতে মোছাতে বললে, 'তোর বউয়েব মাথা ধরেছে।'

'না না, অ্যানাসিন-ফ্যানাসিন দিও না। পেটের পক্ষে, হার্টের পক্ষে খুব মারাত্মক।'

'দেখিস! একটা অ্যানাসিনে মেয়েরা মরে না। কইমাছের প্রাণ। থাকে তো দে।'

'নেই গো।'

'নেই গো!' দিনুর কথাটাই ঠোঁট উলটে উচ্চারণ করে দিনুর গালটা টিপে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। গালে লেগে রইল আদার

গন্ধ। বোধ হয় আদা বাটছিল। অদ্ভুত মেয়ে। মনে পড়ল, সেই চাঁদের আলো, ভিজে ভিজে চুমু, সামান্য শিহরণ।

দিনু এবার চেয়ারে উঠল দ্বিতীয় মালাটা জ্যাঠাইমার ছবিতে ঝোলাবার জন্যে। মালাটা আর একটু বড় হলে ভাল হত। হাসি হাসি মুখে জ্যাঠাইমা তাকিয়ে আছেন দিনুর দিকে। সময় পেছোতে শুরু করেছে। সন্ধ্যে। ঠাকুর ঘর। মিটিমিটি প্রদীপের আলো। চারদিকের দেওয়ালে কাঁপা কাঁপা ছায়া। জ্যাঠাইমা হাত জোড় করে বসে আছেন। পাশে ছোট দিনু। সুরেলা গলা, ভবসাগর তারণ কারণ হে। স্বপ্নময় শৈশব। জীবনকে পাশ কাটিয়ে কতদূরে চলে গেছে সময়ের স্রোতে ভাসতে ভাসতে। আহা! আজ যদি সবাই বেঁচে থাকতেন, বাড়িটা আরও কত জমজমাট হত!

ডেকরেটারের লোক এসে দরজায় দরজায় রেশমী কাপড়ের ঝালর বাঁধছে। ইলেকট্রিসিয়ান সানাইয়ের টং-ঘরে, প্রবেশ পথের দুপাশে ছোট ছোট টুনি ঝোলাচ্ছে। মিউনিসিপ্যালিটির খাবার জলের ট্রেলার এসেছে। সূর্য হন হন করে পশ্চিমের দিকে চলেছে। আকাশের টং-এ চিল ঘুরপাক খাচ্ছে।

সন্ধ্যে যথাসময়ে সেজেগুজে এল। সানাইয়ে ইমন কল্যাণ চড়েছে।

দিনুর সাজগোজ শেষ। দিশী ধুতি। সোনার বোতাম লাগানো সাদা সার্জের পাঞ্জাবি। মামা নিজের হাতে কোঁচায় চুনট করে দিয়েছেন। কানের পাশে আতর ঘষে দিয়েছেন। তাঁর নিজের সাজেও শিল্পীর মেজাজ। হাতে হাড়ের নস্যির ডিবে, সিল্কের রুমাল জড়ানো। ফর্সা চেহারায় সবুজে রঙের গরম পাঞ্জাবি। হাড়ের বোতাম তাকিয়ে আছে। পায়ে কোলাপুরী। মাঝে মাঝে গায়কোচিত গলা খাঁকারি। দিনুর ঘরে খাটের ওপর ঔরঙ্গাবাদের সোনালী বেডকভার। ভেলভেটের সিংহাসন চেয়ারে ফুলসাজে দিনুর বউ। দিনুর পিসতুতো বোনের এক বান্ধবী খাতা আর পেন্সিল নিয়ে রেডি। উপহারের হিসেব রাখবে।

একটা দুটো গাড়ি আসছে। 'আসুন, আসুন' চলছে। একটি শিশু ফোলডিং চেয়ার উলটে মুখ থুবড়ে পড়েছে। তার কান্না, সানাইয়ের

তীক্ষ্ণ সুর, 'ওরে পশ্চিমের আলোটা দপ দপ করছে', 'মাধুরী একটা মালা দে ভাই, খোঁপায় জড়াই', দিনুর বউকে একটি ফচকে মেয়ে কি বলছে, সবাই হাসছে, সিল্কে, যৌবনে, সেন্টে, রান্নার গন্ধে অ্যাটমসফিয়ার জমজমাট। নিরঞ্জন চায়ের ট্রে নিয়ে ঘুবছে। পাতলা কাগজে ছাপা রুমাল—কবিতা হাতে হাতে ঘুরছে, চেয়েছিলে গীতা, পেয়ে গেছ গীতা, কর এবে তুমি সেই আরাধনা, আব কি থাকবে মনে। বয়েসয়ে ভাই, চোখ কান খুলে, জ্ঞানেব সঙ্গে ভক্তি মিশায়ে কর্মের ভিয়েনে ছেঁকে, গীতাকে তোমার সঙ্গী কবে, পাল তুলে চল দলে দলে। ইতি তোমার অমুক তমুক। একটা স্টেশন ওয়াগনে করে শ্বশুরবাড়ির লোকজন এসেছে গোনাগুনতি। বউয়েব ঘবে ঢোকে কাব বাবাব সাধ্যি! কুঁচোকাঁচা, উঠতি পডতি মেযেতে ঠেসে গেছে।

মাঘের শেষ ফাগুনেব শুরু, খুব দখিনা বাতাস ছেড়েছে। বজনীগন্ধা তাজা হয়ে উঠেছে। হাওয়ায তেবপল কাঁপছে। ক্যালেণ্ডারের পাতা উড়ছে। নতুন তোয়ালে কোমবে জড়িয়ে পবিবেশকরা পেতলের বালতি আর হাতা নিয়ে চরকিপাক খাচ্ছে। দিনুব বাবা তসবেব শাল গায়ে হাত জোড় কবে জনে জনে জিজ্ঞেস করছেন, 'ঠিক হচ্ছে তো?'

'ও, খুব হচ্ছে।'

'কেমন বেঁধেছে?'

'জবাব নেই। ওহে, পোলাওটা আর একবার ঘুবিয়ে দাও।'

'এ পাতে মাছ।'

একজন পবিবেশক আর একজনকে ফিস ফিস করে বলছে, 'ছিটে বেড়া। তেত্রিশটা কমলাভোগ সেঁটে এখনও দাও দাও কবছে।' দূরে সুন্দরী একজন মহিলাকে একজন পরিবেশক খুব তোয়াজ করছে, 'বউদি, দইয়ের মাথা. আব একটু, আর এক চামচে।'

সানাই বেহাগ ধরেছে। দিনুর বউ ভেলভেটের সিংহাসন ছেড়ে উঠে পড়েছে। নিমন্ত্রিতদের শেষ ব্যাচ পান চিবোতে চিবোতে বহু দূরে চলে গেছেন। নির্জন রাতে বাতির মালা পাগল-করা দখিনা বাতাসে দুলছে। এবার বাড়ির সবাই খেতে বসবেন। দিনুর পিসিমা এসে

বলছেন, 'ছোড়দা, মোহর, তোমরা সব চল। পাতা করা হয়েছে।'

'বউমা! বউমা বসবে না? দিনু বসবে না?'

'তোমাদের হয়ে যাক।'

'ও নো নো। রাত প্রায় বারোটা হল। সব একসঙ্গে। কতক্ষণ আর টাঙিয়ে থাকবি!'

কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। ছাদের এ মাথায় পুরুষ। ও মাথায় মেয়েরা। দিনুর বউয়ের চিবুকটা পাতায় প্রায় ঠেকে গেছে। মুখের ফাঁদ যতটা সম্ভব কম খুলে টুকুটুকু খাচ্ছে। পরিবেশনকারীরা মিলিটারী মেজাজে পরিবেশন করে চলেছে। সারা সন্ধ্যে খেটে সকলেই প্রায় ক্লান্ত। কেউই খাবেন না। দিনুর বাবা বলেছেন, পরে একদিন সকলকে পরিতোষ করে খাওয়াবেন।

মাঝের বড় হলঘরে ফরাস পড়েছে। মাঝখানে চকচক করছে স্কেলচেঞ্জ হারমোনিয়াম। চিত হয়ে শুয়ে আছে তুঁত কাঠের এসরাজ। সানাই স্তব্ধ। বাতাস ঠাণ্ডা। দিনুর মামার গা থেকে আতরের গন্ধ বেরোচ্ছে। দিনু বসে আছে পা মুড়ে।

এসরাজটা কাঁধে তুলে নিতে নিতে দিনুর বাবা বললেন, 'নাও ধর মোহর। একটা বসন্ত ছাড় তো।'

গণেশকাকা পান চিবোতে চিবোতে বললেন, 'একটু পরোজ মিক্স করে দেবেন।'

একে একে সব বাতিই নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনের গুলোই জ্বলছে। মেয়েরা সব দিনুর ঘরে নতুন বউকে নিয়ে পড়েছে। স্ত্রী-আচার চলছে। ফুলশয্যার প্রস্তুতি।

হারমোনিয়াম থেকে সুর ঠিকরে বেরোল। এসরাজে ছড় পড়ল। দিনুর মামা অপূর্ব সুরেলা গলায় গাইতে লাগলেন, 'হোরি খেলত নন্দকুমার।' দিনুর হঠাৎ মনে হল সে দিনু নয়, সাজাহান। খুব জমেছে। ঠুমরির পর ঠুমরি। কাফি সিন্ধু, পিলুবারোয়া, ধানি, দেশ। ঢং ঢং করে দুটো বাজল।

গণেশবাবু দিনুর বাবাকে বললেন, 'দিনুকে এবারে ছেড়ে দেওয়া

হোক। বেচারা ইমপেশেণ্ট হয়ে পড়ছে। আজ ওর নাইট অফ অল নাইটস।'

'হোয়াট, ইমপেশেণ্ট, নেভাব। তুমি কি ভাব আমার ছেলের সেই ব্রীড!'

দিনু সুবের লতাবিতান ছিঁড়ে ধপাস করে মৃত্তিকায় এসে পড়ল। ইঙ্গিতটার মধ্যে দেহেব গন্ধ। দিনুব ব্রহ্মচর্য আজ শেষ হবে। সে হবে গৃহী। স্ট্যাটাসটাই পালটে গেল। ব্যাচেলাব থেকে ম্যাবেড। গণেশ-বাবু বললেন, 'আই ডোণ্ট মিন ছাট। তবে বাতটাই তো ফুলশয্যাব। সবাই অপেক্ষা কবে আছে।'

'অপেক্ষাই তো মধুব গণেশ। সবই তো থাকবে, থাকবে না এই রাতটা। হাওয়েভাব দিনু ইউ মে গো।' দিনুব মাইমা দিনুকে ধরে ধরে ঘরে নিয়ে গেলেন। মহিলারা ভীষণ অধৈর্য হযে পড়েছেন। দিনুর পিসতুতো বোন বললে, 'ছোট মামাব যেমন কাণ্ড। বাত ভোর হয়ে গেল। কখন আব ঘুমোবে।'

'আরে রাখ্ তোর ঘুম। কত বাত এখন জেগে কাটবে!'

'তা যা বলেছিস ভাই।'

'প্রথমে কত্তা বলবেন গিন্নী শুনবেন, তাবপর বলবেন গিন্নী শুনবেন কত্তা, তাবপব দুজনে বলাবলি কববেন পাড়া-প্রতিবেশী শুনবেন।'

নিজেদেব বসিকতায নিজেরাই হেসে উঠলেন। দিনুকে একটা গরদের ধুতি পবতে হয়েছে। তাব হাতে একটা ডিশ। তাতে একটা সন্দেশ। আধখানা কামড়ে খেয়ে বাকি আধখানা বউকে খাওয়াতে হবে। ডিবেতে দু খিলি পান দুজনের। এক গেলাস জল। দিনুব ঘরটা নিয়ে মহিলা-দের ভীষণ অভিযোগ। সব কটা জানলাই রাস্তার দিকে। এমন একটা ফাঁক-ফোকর নেই যে আড়িপাতা যাবে!

'তুমি তা হলে দরজাটা দিয়ে দাও।'

রাত প্রায় তিনটে। বাইরের বাতাসে শীত আর বসন্ত একসঙ্গে উড়ে চলেছে। মামার গান ভেসে আসছে—'শূন্য এ বুকে পাখি

মোর আয় ফিরে আয়, তোরে না হেরিয়া ওরে উন্মাদ, পাণ্ডুর হল আকাশেব চাঁদ।' সত্যিই তাই। পশ্চিম আকাশে চীনে লণ্ঠনের মত ফ্যাকাশে চাঁদ হাওয়ায় দুলছে। রজনীগন্ধার ঝাড় থেকে দু-একটি আলগা ফুল শব্দ করে টেবিলের ওপর ঝবে পড়ল। উপহারে মোড়া একটা সেলোফোন কাগজ বাতাসে খড়খড় করছে। অনেক দূরে কে যেন বলছে, 'উনুনে এখনও আঁচ আছে, নিরঞ্জন চায়েব জল বসা।'

দিনু বউকে ডাকল, 'গীতা।'

স্বচ্ছ মশাবীব ভেতব থেকে উত্তব এল, 'বল।'

'ঘুমোলে ?'

'না তো।'

'তবে ?'

'জেগেই আছি।'

দুজনে পাশাপাশি বেশ কিছুক্ষণ শুয়ে রইল। দিনু চিৎ, বউ কাত। বেশমী লেপ দুজনকেই ঢেকে বেখেছে। সাবা ঘবে ফুলেব গন্ধ মেখে গোলাপি অন্ধকাব বেণু রেণু হয়ে ভেসে যাচ্ছে। কামসূত্র কি শিখিয়েছে এখন আব মনে পডছে না। গলা শুকিয়ে কাঠ। এক গেলাস জল খেতে পাবলে ভাল হত। অনেক রকম ভাবনা আসছে মনে। বহু ধবনেব শব্দ আসছে কানে। দিনুব মনে হচ্ছে, সারা দেওয়ালে অজস্র জোড়া জোড়া চোখ তাদের দিকে তাকিয়ে আছে। বউযের দিকে একটা কাঁপা কাঁপা হাত বাড়াতে গিয়েও টেনে নিল। মনে হল, হাত ঠেকালেই সাবা ঘরে হিস কবে একটা সম্মিলিত শব্দ ছড়িয়ে পড়বে। দিনু কাঁপা কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করলে, 'গীতা ঘুমোলে ?' কোনও সাড়া পেল না। বালিশে কনুইযের ভর রেখে দিনু নিজেকে তুলে ধরল, ঝুঁকে পড়ল বউয়ের দিকে। মুখটা ওপাশে ফেরানো। পুঁটলি হয়ে শুয়ে আছে। যেন পরের বিছানায় বিদেশী বালিকা। এখনও অধিকারবোধ জন্মায়নি। গাছ কি অত সহজে জমিতে শিকড় নামায়! ছোট্ট কপাল। ফোঁটা ফোঁটা চন্দনের টিপ। চুলের কুঁচি। মুখময় সারাদিনের ক্লান্তি। সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছে।

শুয়ে মটকা মেরে পড়ে নেই। না, তুমি তা হলে ঘুমোও। দিনু লেপটা বউয়ের গায়ে টেনে দিল ভাল করে। মেয়েলী ঘুমের আলাদা একটা সৌন্দর্য আছে। বড় মোলায়েম। পাখির বাসার মত পলকা কিন্তু নির্ভরতায় ভরা। বড় স্নেহ আছে। দিনু একটা পুতুল পেয়েছে।

লেপের আর একটা পাশ তুলে, মশারি খুলে দিনু বাজবেশে খাট থেকে নেমে পড়ল। ভাবমুক্ত হয়ে খাটটা কঁ্যাচ কবে একটা শব্দ ছাড়ল। যাক বাবা, বাঁচা গেল। ফুলশয্যা অতি সহজে শেষ হল। ফাঁড়া কেটে গেল। ওদিকে উনি আবাব আর একটু সবতে গিয়ে খাট থেকে পডে যাবেন না তো! পাশ বালিশটা দিতে পাবলে ভাল হত। যাক গে, যা হয় হবে।

একটা পাখি ডেকে উঠল। বাত প্রায় শেষ হয়ে এল। চাঁদ আবও ফ্যাকাশে। তারার বঙ সাদা। ঘবেব বাইরে যাওয়া যাক। দিনু দরজাব ছিটকিনি খুলতেই একটা দেহ চিত হয়ে চৌকাঠে তাব পাযেব কাছে লুটিয়ে পড়ল। দিনুব বিস্ময কাটাব আগেই পায়ের কাছে উলটে পড়া মূর্তি আড়ামোড়া ভেঙে বসতে বসতে বললে, 'আড়ি পাততে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম বে। সাবাদিন কত খেটেছি বল্।'

'বিছানায় শুলেই পাবতে। যাও, আমাব বিছানায় গিয়ে একটু শুয়ে পড়। এখনও অন্ধকাব আছে।'

দু হাত মাথাব ওপব তুলে খোঁপা ঠিক কবতে কবতে দিনুর পিসতুতো বোন মেঝেতে পা ছড়িয়ে বসে থেকেই বললে, 'এখন আর শোব না রে, ঘুমোলে আব সহজে উঠতে পাবব না। তোবা কি কথা বললি রে! শুধু তো একবার শুনলুম, গীতা ঘুমোলে। তাবপব নিজেই ঘুমিয়ে পডলুম।'

'ওই একই কথা আব একবার বলেছিলুম। তুমি শুধু শুধু এত কষ্ট করলে কেন!'

'করতে হয় রে। অনেক কালের নিয়ম আড়িপাতা।'

দিনু ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বাইরেটায় বেশ ঠাণ্ডা। শীত শীত করছে। চোখ জ্বালা করছে। লম্বা হলঘরে শূন্য ফরাস। একপাশে

হারমোনিয়াম, অন্য পাশে এসরাজ টানটান শুয়ে। একটা খালি প্লেটে গোটা কতক লবঙ্গ। চারদিকে থই থই আলোআঁধারি। বিয়ের বাসি বাড়ি। সময় এক রাতেই সব উৎসব মুছে নিয়ে চলে গেছে। বহুদিন হয়তো আব ফিবে আসবে না। প্রতিদিনের সাধারণ জীবন যেমন চলছিল তেমনি চলবে। স্মৃতি ম্লান হয়ে আসবে। এক কাপ চায়ের সন্ধানে দীনু বেবিয়ে পড়ল।

বছব থেকে বছর ঘুরে গেল। জীবনেব সেতু সময়ের নদীর ওপর দিয়ে একটু একটু কবে বড় হতে হতে সাতটা বছবের পিলার পেরিয়ে এল। সেই বাড়ি। জীবনটা শুধু ঝরতে ঝরতে, ক্ষইতে ক্ষইতে সরু হয়ে এসেছে।

॥ দুই ॥

মাঘেব শেষ ফাল্গুনেব প্রথম, খুব দখিনা বাতাস ছেড়েছে। দীনু দাঁড়িয়ে আছে দোতলাব ঘবে কাছা গলায়। নীচে সোবগোল, 'খাট এসেছে, খাট এসেছে।' দিনু চমকে উঠল। অনেক দিন আগের অস্পষ্ট স্মৃতি। সেদিনও খাট এসেছিল, সেদিনও উৎসব ছিল, সেদিন সানাই ছিল। সে উৎসব ছিল আনন্দেব, আগমনেব। আজকের উৎসব বিদায়েব, বেদনাব। বাবা চলে গেছেন। অগ্রদানীকে দেবাব খাট এসেছে। লেপ, তোষক, বালিস, চাদর আগেই এসে গেছে। গতকাল ঘাট গেছে, আজ শ্রাদ্ধ ব্রাহ্মণ ভোজন প্রভৃতি অনুষ্ঠান। বাবার ঘরেই বাবার ছবি ঝুলছে। প্রমাণ মাপের ছবিটি সবে হয়ে এসেছে। বীরেনবাবুর হাতের কাজ। ফটোব ওপব নিপুণ হাতে রঙ লাগিয়েছেন। ফ্রেমটা ঝকঝক কবছে। দিনু ছবিটা নামাতে এসেছে। নীচের শ্রাদ্ধ বাসরে ছবিটি বসবে। চোখে চোখে থাকবেন।

ঘরের কোণে একটা টুলে। তার ওপর ভাঁজ করে করে খবরের কাগজ রাখা। শেষ কাগজ পড়েছেন গত পনেরো তারিখে। চশমার

খাপটা টেবিলের ওপর সেই যাবার দিনের মত করে রাখা। বিছানায় টানটান চাদরপাতা। চটি. দু'পাটি খাটের তলায়। দেওয়াল-আলনায় জামা, ধুতি, চাদর, সাদা সোয়েটার। এই যেন বাথরুমে গেছেন। এখুনি এসে পড়বেন গামছায় হাত মুছতে মুছতে। মৃত্যু যেন অদৃশ্য আততায়ীর মত ওত পেতে থাকে। কখন যে হঠাৎ লাফিয়ে এসে খপ করে টুঁটি টিপে ধরে।

সেদিন সকালে অফিস বেরোবাব সময় সব কিছুই স্বাভাবিক ছিল। দিনুর ছ' বছরেব ছেলে ফ্ল্যানেলের জামা, পাজামা, সোয়েটার পরে, হাতে একটা লাল বল নিয়ে দাদুব কোলে বসে পা নাচাচ্ছিল। দিনু প্রণাম করে হাসি হাসি মুখে ঘব থেকে বেরিযে এল। সামনেই তাব বউ গীতা। হাতে দু' গেলাস দুধ। কথায় কথায় বলে আমাব এখন দুটো ছেলে, ছোট খোকা আব বড় খোকা। দুটোকেই দুধ খাওযাতে জীবন বেবিয়ে যায়। বেলা দুটোব সময সব শেষ। হযতো কিছু বলার ছিল, শোনা হল না।

দিনু এসে দেখল টেবিলের ওপব একবাশ গ্রামাব আব ট্রান-শ্লেসানেব বই। হাওয়ায় পাতা উড়ছে। চশমাটা উপুড় হয়ে আছে। বাবার চোখের দৃষ্টি মহাশূন্যে স্থিব। মুখে ক্ষীণ হাসি। বাল্‌ব আছে, আলো নেই। একটা সূক্ষ্ম তাব কোথাও ছিঁড়ে ঝুলে পড়েছে।

ইদানীং খুব গ্রামাব আর ট্রান্‌শ্লেসানের বই পডছিলেন। দিনু একদিন অবাক হয়ে ব্যাপারটা জানতে চেয়েছিল। বলেছিলেন উত্তর পাবে জাতকের ভূমিকায়। দিনু জাতক খুলে দেখেছিল : শুদ্ধ এক জন্মেব কর্মফলে কেহই গৌতম প্রভৃতিব ন্যায় অপার বিভূতিসম্পন্ন সম্যকসম্বুদ্ধ হইতে পারেন না; তিনি বোধিসত্ত্ব অর্থাৎ বুদ্ধাঙ্কুব বেশে কোটি কল্পকাল নানা যোনিতে জন্মজন্মান্তব পবিগ্রহপূর্বক দানশীলাদি পার-মিতার অনুষ্ঠান দ্বারা উত্তরোত্তর চরিত্রের উৎকর্ষসাধন করেন এবং পরিশেষে পূর্বপ্রজ্ঞা লাভ করিয়া অভিসম্বুদ্ধ হন।

আবার তাহলে আসতে হবে! কোথায়! কিভাবে!

গীতা এসেছে। একমাথা রুক্ষ চুল। সাদা কোরা শাড়ি। করুণ

মুখে ছলছলে দৃষ্টি। 'তুমি একা একা এ ঘরে কি করছ? চল কাজে বসবে চল। ভট্‌চাজ্যিমশাইরা এসে গেছেন।'

বুকের কাছে ছবিটা দু হাতে আঁকড়ে ধরে দিনু সিঁড়ি ভেঙে নামছে। আজ আর সানাই নেই। নিরঞ্জন নেই, দিনুর মামা নেই, গণেশকাকা নেই। সেদিনের সেই হালুইকর বিচিত্র নেই। সেদিনের নিমন্ত্রিতদের মধ্যেও অনেকে নেই। আম আর অশ্বত্থ গাছে সবুজ সোনা পাতার লুটোপুটি। গীতার গলায় ভাঁজ পড়েছে। দিনু সব দেখতে পাচ্ছে। সময় চলেছে নদীর মত ভাঙতে ভাঙতে গড়তে গড়তে।

কীর্তনীয়ারা এসে আসর জাঁকিয়ে বসেছেন। খোল বেজে উঠেছে কুপক কুপক করে। বড় একা লাগছে আজ। জনসঙ্গেও নিজেকে আজ বড় নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছে। কীর্তনীয়ারা হঠাৎ গেয়ে উঠলেন :

আমি একা রইলাম ঘাটে
ভানু সে বসিলো পাটে···

দিনুর বাবা বেঁচে থাকলে দিনুর মামাকে বলতেন, 'আহা, অ্যাটমস-ফিয়ারটা বেশ জমেছে মোহর।'

জোয়ার

শচিন আর শচিনের মেয়ে একসঙ্গে খেতে বসেছে। ছুটির দিন বাপ আর মেয়ে একসঙ্গে পাশাপাশি খেতে বসে। শচিন চল্লিশ পেরিয়ে সামনের কার্তিকে একচল্লিশে পড়বে। শচিনের মেয়ে শুভার বারো চলছে। মেয়েটির বেশ কথা ফুটেছে। সব সময় কথার খই ফুটছে মুখে। আজকাল মায়ের কাজকর্মের সমালোচনা করারও সাহস হয়েছে। মাঝে-মধ্যে চড়-চাপড়ও খায় এর জন্যে। তবু বলতে ছাড়ে না। শচিন অবশ্য মেয়েকে বাঁচাবার চেষ্টা করে। করলে কি হবে, শুভার মার আবার রেগে গেলে জ্ঞান থাকে না।

শুভা ডালের বাটিটা দেখিয়ে বাবাকে বললে, 'চেহারাটা দেখেছো ?' শচিন আগেই দেখেছে। এক বাটি কালচে জল। মনে মনে সে যা ভাবছিল, মেয়ের মুখে সেই ভাবনাটাই কথা হল।

শচিন বললে, 'মালটা কি বল তো ?' শচিন এই ভাবেই কথা বলে।

'মালটা হল মার হাতের বিখ্যাত মুগের ডাল।'

'কি দিয়ে এরকম চেহারা করে বল তো ?'

'জিগেস কর না।'

শচিন একটু থমকে গেল। অলকাকে ডেকে ডাল সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করা মানেই ব্যাপারটাকে অনেকদূর গড়াতে দেওয়া। কেঁচো খুঁড়তে বড় বড় সাপ বেরনো। খেতে বসে অশান্তি শচিন ভালবাসে না। মাসখানেক আগে অম্বলের অসুখে ভীষণ কষ্ট পেয়েছে। শ'পাঁচেক টাকা ওষুধে পথ্যে বিধু ডাক্তারকে ধরে দেবার পরও অম্বল যখন কিছুতেই সারল না, জল খেলেও অম্বল, তখন সুনীলবাবু শচিনকে ধরে নিয়ে গেলেন এক মনস্তত্ত্ববিদের কাছে। সুনীলবাবু শচিনের সহকর্মী। সে ভদ্রলোকের অম্বলও কিছুতেই সারছিল না। মনস্তাত্ত্বিক ডক্টর

এইচ এস ঘোষ তিনটে সিটিংয়েই সুনীলবাবুর সব অম্লরস মধুররস করে দিয়েছেন।

সেই ডক্টর ঘোষ শচিনকে বারবাব বলেছেন, 'অম্বল, পেটের অসুখ, বুক ধড়ফড় প্রভৃতি সমস্ত অসুখের নাইনটি নাইন পয়েন্ট নাইন পার্সেন্টই সাইকো-সোম্যাটিক ডিজিজ। মন চাইছে অসুস্থ হতে তাই দেহ অসুস্থ হযে পড়ছে। মনটাকে কনট্রোলে বাখুন। রোজ সকালে পট্টবস্ত্র পরে গীতাপাঠ কববেন, স্পেশ্যালি দ্বিতীয় অধ্যায়। মনেব দাঁড়ে সব সময একটি খুশি খুশি পাখিকে বসিযে রাখবেন, মনেব আকাশ যে সব সময গানে গানে ভবে রেখে দেবে। আর বাড়িতে একটা ফতোয়া জাবি কবে দেবেন, খাবাব সময় স্রেফ স্ফূর্তি, কোনও-বকম চেঁচামেচি, হই হই, ঝগডাঝাটি, অশান্তি কিচ্ছু চলবে না। প্রশান্ত মনে, তন্ময হযে খাদ্যবস্তুকে আক্রমণ করবেন। খাবার সময় যাদেব আপনি অপছন্দ কবেন তাদেব ধাবে কাছে ঘেঁষতে দেবেন না, তাদেব কথা চিন্তাতে পর্যন্ত আনবেন না। পারলে, খাবার সময় রেকর্ড-প্লেয়াবে কি টেপবেকর্ডাবে হালকা কোন গান চালিয়ে দেবেন। মিউজিক। খাবাব ঘবের দেওয়ালটা উজ্জ্বল বঙে বাঙিয়ে দেবেন। জানালায় ঝুলিয়ে দেবেন বাহাবি পর্দা। ফুল বাখবেন, কিছু ফুল। আসল ফুল খবচে সামলাতে না পাবলে প্লাস্টিকের ফুল। দূবে কোথাও বেশ ভাল একটা ধূপ জ্বেলে বাখবেন। হাওয়ায় গন্ধ ভেসে আসবে ফুরফুর করে। খেতে বসবেন পরিষ্কাব পবিচ্ছন্ন জামা কাপড পরে। কেলে লুঙ্গি কিংবা খেঁটে গামছা পবে খেতে বসা চলবে না। যুযুৎসু অথবা ক্যারাটে শেখাব পোশাক দেখেছেন। লুজ ঢলঢলে, ধবধবে সাদা। পবিবেশন যিনি কববেন, যদি স্ত্রী হন বলবেন ঝলমলে উজ্জ্বল শাড়ি পবে, গাযে সেণ্ট মেখে পবিবেশন কবতে। যদি কাজের লোক রেখে থাকেন এবং সে যদি পবিবেশন কবে, তা হলে কৃপণতা না করে তার কাপড় জামার পেছনে নিজেব অম্বলেব স্বার্থে বাড়তি কিছু খরচ করবেন। কথায় বলে পেটপূজো। সেই পূজোর আয়োজনে কোন ত্রুটি থাকলে চলবে না। 'আহার কর মনে কর আহুতি দি শ্যামা মাকে।'

শচিন মেয়েকে বললে, 'চেপে যা না, যা পাবি চোখ কান বুজিয়ে খেয়ে যাবি। খুঁতখুঁতে স্বভাব ভাল নয় বুঝলি। পেট ভরান নিয়ে কথা।'

'তুমি কখন কি যে বল বাবা? এই সেদিন বললে ডাক্তার ঘোষ বলেছেন, খাবাবেব রঙ গন্ধ এমন হবে, দেখলেই যেন ভেতরটা খাব-খাব করে ওঠে। তুমি বললে, মাসকাবাব হলে ভাল ভাল সব প্লেট, ডিশ কিনে আনবে। ঝকঝকে, চকচকে খাবাব টেবিল তৈবী করাবে, চাবখানা চেযার।'

'তোব জন্যেই তো কেনা গেল না।'

'আমাব জন্যে?'

শচিন ঠোঁটে আঙুল বেখে স্‌স্‌ শব্দ কবে সাবধান কবে দিল। পাশের বান্নাঘব থেকে অলকা আসছে। দু'বাটি ডাল দিয়ে বসিযে দিয়ে গিয়েছিল, এইবাব বাকি মালেবা একে একে আসছে। শচিনেব মনে হল, প্রথম স্যাম্পেলটি যা ছেড়েছে তাইতেই আমরা কাত। তোমাব বাকি কেবামতি যা যা বেবোবে, বোঝাই গেছে। হায় অলকা, যৌবনে মনোযোগ দিয়ে বান্নাটা যদি একটু শিখতে। একেবাবে গোয়ানিজ কুক হতে হবে, একথা কেউ বলছে না, কিন্তু নিতান্তই মুখে দেবাব মত একটা কিছু দাঁড কববাব ক্ষমতা যদি তোমাব থাকত! আমি নিজেই যে তোমাব চেযে ভাল বাঁধাব ক্ষমতা বাখি। শচিন ভাবনাটাকে মাঝারি বকমের একটা গলাখাঁকাবি দিয়ে মন থেকে বেব কবে দেবাব চেষ্টা করল। ডাক্তাব ঘোষ বলেছেন, 'বি চেয়ারফুল, বি চেয়াবফুল।'

হুঁউউ গীত গাতা চল, ডঁডঁড গীত গাতা চল, শচিন নখেব টুসকি দিয়ে ডালেব বাটির গায়ে একটু মিউজিকেব মত কিছু করা যায় কিনা চেষ্টা কবল। কোথায় সুর! বেসুবো ডাল থেকে কি আর কাফী ঠুমরি বেরোয়! কেলে মত একটু ডালের জল মেঝেতে ছলকে পড়ল।

অলকা ভাতের থালাটা দক্ষিণী-নাচেব মুদ্রার কায়দায় মেঝেতে রাখতে রাখতে বললে, 'পাঁচ টাকা কিলো, ফুর্তিটা ডালের বাটির ওপর না দেখিয়ে নিজের মনেই চেপে রাখার চেষ্টা কর। পাশেই কলাগাছ বড়

হচ্ছে। বিয়েব খরচটা তোমাব ঘোষ ডাক্তার যোগাবে না। তাব ব্যবস্থা তোমাকেই করতে হবে।'

শুভা জিজ্ঞেস করল, 'বাটিতে এটা কি মা?'

অলকা মেযেব দিকে কটমট কবে তাকিয়ে বললে, 'খেয়ে দেখ। হাতে পাঁজি মঙ্গলবাব।'

'এটা খাবাব জিনিস কিনা সেটা তো আগে জানা দবকাব।'

'চুউপ।'

অলকাব 'চুপ' যেন বোমাব মত ফাটল। শচিন চমকে উঠেছিল। শুভাবও চোখ পিটপিট করে উঠেছে।

'বাপেব আশকাবায় একেবাবে মাথায় উঠে বসেছে। যা দোব মুখ বুজে খেতে পাব খাও না পাব উঠে যাও। আমাব কাছে অত খাতির-খুতিব নেই।'

মায়েব চিৎকার আব আসন থেকে স্প্রিঙেব মত মেয়েব লাফিয়ে ওঠাটা এমনভাবে মিলে গেল, শচিনেব মনে হল, অলকার পায়ের চাপে স্প্রিং-লাগানো একটা বাক্সব ডালা খুলে গেল। শুভা শচিনের পেছন দিক দিয়ে গুমগুম কবে পা ঠুকে ঠুকে খাবার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মা, মেয়ে দুজনেই সমান রাগপ্রধান।

শচিন ডাকল, 'শুভা, শুভা বাগ কবিসনি মা, যাসনি, আয়।'

অলকা বললে, 'মা বলে আদর দিয়ে মাথাটা আর খেও না দয়া কবে। পেটেব জ্বালা ধরলে ঠিক এসে খাবে। পেটের জ্বালা বড় জ্বালা। তুমি খেয়েদেয়ে আস্তেআস্তে সবেপড়। আজ বিকেলে কল্যাণী আসবে না। তোমাদেব খাওয়া হলে স্তূপ বাসন নিয়ে বসতে হবে আমাকে।'

'তোমার কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই। খেতে বসিয়ে শত্রুর সঙ্গেও দুর্ব্যবহার কবতে নেই। মেজাজটা সব সময় এমন চড়া পর্দায় বেঁধে বেখেছ, সাপের মেজাজও হার মানে। কথায় কথায় ফোঁস!'

'হ্যাঁ কথায় কথায় ফোঁস! আমাব মেজাজ ওই রকমই জানই তো। আমি সব সময় তুমি মশাই তোমার ন্যাজ মশাই করে চলতে পারব না। আমার হল, ধর্ তক্তা মার্ পেরেক। সংসার আমাকে কি দিয়েছে, কি

দিয়েছে শুনি ? সংসারে বলির পাঁঠা হয়ে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।'

'পাঁঠা নয়, বল পাঁঠী। রেগে যাও ক্ষতি নেই গ্রামারে ভুল করো না।'

শচিন আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে গেল, শরীরটা দু'ভাঁজ হয়েছে, শেষ ঠেলায় এইবার নিজেকে সোজা করলে হয়, অলকা এক ধমক লাগাল, 'উঠছ কোথায়, উঠছ কোথায় শুনি ?'

'যাই মেয়েটাকে ধরে আনি। ও না খেলে আমি খাই কি করে ?'

'আহা মেয়ে সোহাগী রে! তোমার ভাবনা তুমি ভাব। মেয়ের ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না। আমার মেয়ে আমি বুঝব। অয়েল ইওর ওন মেশিন!'

ডক্টর ঘোষ বলেছেন, খাওয়ার এক ঘণ্টা আগে ও পরে নিজেকে কোনও রকম উত্তেজনার মধ্যে জড়িয়ে ফেলবেন না। কাম, অ্যাবস-লিউট কাম, ভরা নদীর মত শান্ত, তরঙ্গহীন। উত্তেজনা মানেই ভেগাস নার্ভের ছটফটানি, সঙ্গে সঙ্গে অ্যাসিড।

অ্যাসিড পেটের মধ্যে ছাড়া থাকতে থাকতে, উদরের মিউকাস মেমব্রেন খেয়ে ফেলবে। দেখতে দেখতে জবরদস্ত আলসার, তারপর ফ্যাঁস করে একদিন পেটটা ফুটো করে দেবে। বাঁচতে যদি চান, জেনে রাখুন দারা-পুত্র পরিবার তুমি কে, কে তোমার!

ঠিক আছে বাবা, বাপ ঠাকুর্দার আমলে বলত কর্তার ইচ্ছায় কর্ম, এ যুগে গিন্নির ইচ্ছায় কর্ম। শচিন আবার ফোলডিং টেবিল ল্যাম্পের মত ভেঙে পড়ল। মাথাটা থালার ওপর হেঁট। পাশে মেয়ের আসনটা খালি। তার বয়েসের মাপের ছোট্ট থালায়, এক মুঠো ভাত, কয়েক টুকরো আলু ভাজা। গুলি গুলি কয়েকটা বড়ি ভাজা একপাশে গড়া-গড়ি পড়ে আছে। শুভা রেগে আসন থেকে উঠে যাবার সময় আসনটা একটু গুটিয়ে গেছে। শচিন আড় চোখে একবার তাকিয়ে দেখল। ছোট্ট একটা মাছি থালার ওপর ভনভন করছে। এর নাম খাওয়া। সুখের আহার। ইংরেজের জেলখানায় স্বদেশীরা অনশন করত। পুলিস হাতে ব্যাটন নিয়ে সামনে এসে বসত, গলায় বাঁশ পুরে জোর করে খাওয়াত।

এ যেন ছেলে পুলিসের বদলে মেয়ে পুলিস। হাতে ব্যাটনের বদলে হাতা। সংসার কারাগারে স্ত্রীর হাতে স্বামী নির্যাতন। এভাবে কি খাওয়া যায়? গলায় গাদা যায়? মেয়েটার মুখের ভাত পড়ে রইল, সে বাপ হয়ে কেমন করে খায়? তবু অশান্তির চেয়ে শান্তি ভাল। ডক্টর ঘোষ বলেছেন···।

খাবার আসনে শচিনকে দাবড়ানির আঠা দিয়ে আটকে রেখে অলকা রান্নাঘরে গেছে পরের কেবামতিগুলো আনতে। যেমন ভাতের ছিরি তেমনি ডালের ছিরি। ভাজা! ভাজায় আর কি কেরামতি থাকতে পারে! কম তেলে আধপোড়া। আহা! কোথায় গেল মায়ের হাতের আলু ভাজা! কোথাও এতটুকু বেশি কি কম ভাজা নেই! হালকা বাদামী বঙ! মুখে দিলেই মুচমুচ শব্দ! তেলের কালচে খাঁকরি লেগে নেই। অলকাব ভাজা আলু যেন ভূতের খোকা! কাজল চট-কানো খোকাব মুখ। কৃপণরা কি আলু ভাজতে পারে! ভাজাভুজিতে দিল চাই।

অলকা আবার এসেছে। উনুন থেকে সাঁড়াশি দিয়ে সরাসরি তুলে এনেছে কেলে একটা কড়া। তেল তখনও পিটপিট করে ফুটছে। এই দৃশ্যটা শচিনেব কাছে ভীষণ ভীতিপ্রদ। তেলসুদ্ধ গরম কড়া সাঁড়াশির ঠোঁট আলগা হয়ে কোনদিন যদি ধপাস করে সামনে পড়ে শচিনের নির্ঘাত মৃত্যু। গরম তেল ছিটকে চোখে মুখে সর্বশরীরে। চোখ দুটো তো যাবেই সেই সঙ্গে মুখের চেহারা হবে চল্লিশ স্ক্রীনে ছাপা ব্লকের মত কালো কালো বিন্দু বিন্দু। বিয়ে করে বিল্বমঙ্গল। শচিন বহুবার স্ত্রীকে সাবধান কবেছে, ওহে ভালমানুষের মেয়ে, তোমার এই বিপজ্জনক প্রথাটি দয়া করে ছাড়। কে কার কথা শোনে। চোরা না শুনে ধর্মের বাণী। কথাই যদি শুনবে তা হলে স্ত্রী হবে কেন? প্রতিবাবই অলকার এক উত্তর, 'কড়া আমার হাতে। ভবিষ্যৎও আমার হাতে। ভাগ্যকে যেভাবে নিয়তি ধরে থাকে, আমার হাতের সাঁড়াশিও সেই ভাবে কড়ার কানা ধরে আছে। কারুর বাপের সাধ্য নেই কখন কি হয় বলে!' ঠিকই তো? ভয়ে মরলেই সেকসপিয়ার, কাওয়ার্ডস ডাই মেনি

টাইমস, আর একটু এগোলেই রবীন্দ্রনাথ, মরতে মরতে মরণটারে।

শচিন অবশ্য ভেবেই রেখেছে, সত্যিই যদি তেমন কিছু হয়, নিয়তির ঠোঁট আলগা হয়ে কড়া যদি দড়াম করে মুখের সামনে পড়ে এবং চোখ ফুটো যায়, তাহলে ওই মোড়ের মাথায় চেটাই পেতে সিঙ্গল রিডের হারমোনিয়াম নিয়ে সামনে একটা কানা-উঁচু থালা রেখে সারাদিন গান গাইবে, ভালবাসার আগুন জ্বেলে কেন চলে যাও। অলকা পাশে বসে এক হাতে মাথায় ধরে থাকবে বঙ-চটা ছাতা আর এক হাতে মাঝে মাঝে হাতপাখা নেড়ে বাতাস করবে। এই রকম একটি হতভাগ্য দম্পতিকে সে রোজই পথে দেখে। মাথায় ছাতা ধরবে! হাতপাখা নেড়ে বাতাস করবে! কে, অলকা! এমন দিন কি হবে মা তারা।

অলকা বাঁ হাতে ধরা সেই ভয়ঙ্কর তপ্তকটাহের ফুটন্ত শব্দায়মান তেল থেকে খুন্তি দিয়ে একটি ভাজা মাছের দাগা তুলে শচিনের ভাতের ওপর ধপাস করে ফেলে দিয়ে বললে, 'সঙের মত বসে না থেকে দয়া করে খেয়ে উঠে যাও না। সংসারের পাট তো আমাকে চুকোতে হবে, না সারাদিন বসে থাকলেই চলবে!'

শুভার পাতেও অনুরূপ ভাবে একটি মাছের খণ্ড পড়ল।

শচিন না বলে পারল না, 'ওর পাতে শুধু শুধু দিচ্ছ কেন, ও তো খাবে না।'

'খাবে না মানে, ওর বাবা খাবে।'

শচিন ভাবলে ওর বাবা তো খাচ্ছেই, আর কি ভাবে খাবে। পেঁকো ভাতের ওপর কেলে ডাল ঢেলেছে, ডাল আবার গলেনি। বাটির তলায় আঙুল চালিয়ে গোটা গোটা কিছু মুগের দানা তুলে এনে পিণ্ডের ওপর যে ভাবে তিল ছিটোয় সেই ভাবেই ছড়িয়ে দিয়েছে, সতিল পিণ্ডোদকং সকাতলা মৎস্যং। এক টুকরো লেবু হলে মন্দ হত না। অলকাকে বলার সাহস নেই। শুভা থাকলে বলা যেত। সে তো এখন গোঁসা ঘরে।

শোবার ঘরের রেডিওটা হঠাৎ বেজে উঠল। আহা নজরুলের সেই গানটা, 'জনম জনম গেল আশাপথ চাহি।' শুভা খাওয়া ছেড়ে উঠে

গিয়ে মনের দুঃখে রেডিও খুলেছে। ডক্টর ঘোষ বলেছেন খাবার সময় একটু গান একটু কনর্সার্ট।

হঠাৎ কনসার্ট থেমে গেল। অন্য কনসার্ট কানে আসছে।

'শিগগির চল, শিগগিব চল, এক থেকে তিন গুনব, তার মধ্যে সুড়সুড় করে উঠে আসবি। এক, দুই, তিন। উঠলি! কি হল, উঠলি! ভাল কথায় উঠবি, না যাব? কি রে?

'আমি খাব না, যাও।'

'বাপেব পয়সা সস্তা দেখেছ, না? লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন! ওঠ, শুভা ওঠ, শুভা ওঠ বলছি। আমার মেজাজ কিন্তু আস্তে আস্তে চড়ছে। এবার বলতে গেলে আর মুখে নয় হাতে বলব।'

শচিন মুখটাকে বিকৃত করল। মেজাজ চড়ছে। আর কোথায় চড়বে বাবা। তিনি তো সব সময় সপ্তমেই চড়ে আছেন। না, ডক্টর ঘোষ বলেছেন, মনটাকে পাবিপার্শ্বিক ব্যাপার থেকে তুলে রাখবেন। নিজেকে অনেকটা নিরোব মত কবতে হবে। রোম পুড়ছে পুড়ুক, আপনি ছাদের আলসেতে বসে ব্যায়লা বাজাচ্ছেন। তা না হলে পরিপাকে বিপাক এবং অম্বল।

শযনকক্ষে মা মেয়েব খণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। মায়েরই তো মেয়ে। দুজনেই একবোখা বুলডগ। বুলডগ কামড়ালে তাব চোয়াল আটকে যায়। মাংস না খাবলে সে কামড় খোলে না। এদেরও তাই! এর গোঁ ওকে, ওব গোঁ একে কামড়ে ধরে আছে। মেয়ে খাবে না মাও ঘাড় ধরে খাওয়াবেই। দবকার হলে ল্যাং মেরে চিৎ করে ফেলে বাঁশ গেদে খাওয়াবে। অনশন ভঙ্গেব দৈহিক ব্যবস্থা। ওরে আমাব বুলু ডগুয়ারে। শচিনেব শান্ত স্বভাবের ছিটে-ফোঁটাও যদি শুভার চরিত্রে লাগত! কি করে লাগবে। মেয়েদের শরীরে মায়ের রক্তই যে বেশি তা না হলে মেয়ের বদলে ছেলে হত!

ঘাড় ধরে বেড়ালছানাকে যেভাবে তুলে আনে অলকা সেইভাবে শুভাকে ধরে এনে ধপাস করে আসনে বসিয়ে দিল।

'আর যেন একটা কথাও আমাকে না বলতে হয় শুভা। সেই

সকাল থেকে রান্না ঘরে। এর মধ্যে ছ'বার চা হয়েছে। খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে আমার। তোমাদের আর কি, খাবেদাবে ঘরে গিয়ে ফ্ল্যাট হয়ে শুয়ে পড়বে। আমি একটা মানুষ, ধোপার গাধা নই!' দাঁতে দাঁত চেপে গাধা শব্দটা অলকা এমন ভাবে উচ্চাবণ করল! অ্যাঃ, মহিলার সমস্ত স্নায়ু ড্যামেজ হয়ে গেছে। কামড়ে না দেয়? দাঁতাল, মাতাল আর পাগল! বিশ্বাস নেই! খুব সাবধান।

শুভা হাত গুটিয়ে মুখ গোঁজ কবে বেঁকে বসে আছে। খুবই স্বাভাবিক। শচিনদের ছেলেবেলায় মাঝে মধ্যে এইরকম ঘটনা অবশ্যই ঘটত। সেই সময়কার ভিকটোবিযান 'গোল্ডেন টাইমে' মায়েরা এই রকম পুলিসী প্রথায় বিশ্বাসী ছিলেন না। বলতেন, চ বাবা, ওঠ মা; বাগ করিসনি। বাগী ছেলে কি মেয়ে বলত, না যাব না, না খাব না। মা, মাথায় পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে বলতেন, চল বাবা, চল মা। যাবি না তো! ঠিক আছে কাল সকালে আমাকে আব দেখতেই পাবি না। কোথায় যাবে তুমি? দেখতেই পাবি, যমে নিয়ে যাবে তেপান্তবের মাঠ পেরিয়ে। ব্যাস, হাউ হাউ কান্না। না মা যেও না তুমি।

মায়ের ফর্সা সাদা কপালে লাল টকটকে সিঁদুবেব টিপ। ঘামে, আঁচলের ঘষায় একটু ছড়িয়ে গেছে। গোল হাতে মিছবি-দানা চুড়ি। লাল পলা, সাদা শাঁখা পাশাপাশি। মাকে জড়িয়ে ধরে সে কি কান্না। মা অমনি বলতেন, দূর পাগল, তোদের ফেলে যাব কোথায়! কার কাছে ভরসা করে রেখে যাব! কত কাজ বাকি। অসম্ভব তেতো নিমঝোলও তখন চুমুক দিয়ে খেতে আপত্তি নেই।

আর এখন? অ্যাঁ, কি যুগ পড়লরে বাবা? মিলিটারি ক্যাম্পে মহিলা মেজর জেনারেলের সঙ্গে সংসাব। সবসময় কুচকাওয়াজ চলেছে! শচিন মনে মনে বললে, 'এবার থেকে তুমি ইউনিফর্ম পবে হাতে বেটন নিয়ে খাবার তদারকি কোরো? সেইটাই মানাবে ভাল।'

শচিন বললে, 'শুভা খেয়ে নে মা! কেন অশান্তি করছিস! দুপুর থেকেই মেঘ জমে জমে সন্ধ্যের কালবোশেখী!'

'তুমি খাচ্ছ খাও। আমি খাব না। ওকে আমি দেখে নোব!'

'কাকে দেখে নিবি ?'

'তোমার বউকে ?'

'হোয়াট ! কি বললি ?'

শচিনের হোয়াট অলকার 'চুপ' এর চেয়ে জোরে বেরল। রাগটাকে এতক্ষণ অনেক কষ্টে চেপে চেপে বেখেছিল। এইবার বোমা ফাটল।

অলকা পাশেব ঘর থেকে ছুটে এল। হাতে একটা হাতা।

শচিন চিৎকাব করে বললে, 'গেট আউট। তোমাকে খেতে হবে না। বড্ড বাড় বেড়েছ শুভা। মেয়েছেলে বলে তোমাকে আমি ছেড়ে দোব না বাসকেল। কানটাকে টানতে টানতে ছাগলের কানেব মত লম্বা কবে ছেড়ে দোব স্কাউনড্রেল।'

মায়েব বকুনি শুভাব তেমন গায়ে লাগে না। খেয়ে খেয়ে অভ্যস্ত। বাপেব ধমকধামকে ঠোঁট ফুলে যায। অনেক দিন পরে শচিন খেপেছে। শুভাব চোখে অভিমানেব জল। শচিন সে সব তেমন গ্রাহ্য করল না।

হাতা উঁচিযে দবজাব গোড়া থেকে অলকা বললে, 'শুধু শুধু মেয়েটাকে বকছ কেন! হঠাৎ আবাব কি হল। এই তো দেখে গেলুম মেয়ের সোহাগে উলটে পড়ছ।'

'তোমার ট্রেনিং-এ এই বয়সেই ইনি গোল্লায় গেছেন। যেমন মা তার তেমনি মেয়ে!'

'যা বলবে মুখ সামলে বলবে। মেয়েকে হচ্ছে হোক, মাকে ধরে টানাটানি করবে না।'

'ওই তো, ওই তো তোমার বচনের ছিরি! সাইকোলজিস্টরা কি বলেন জান, ছোটবা সব সময় বড়দের চালচলন নকল করে, বিশেষত মায়েদের। শুধু জন্ম দিলেই মা হওয়া যায় না। মায়ের মত মা হতে হয়। ত্যাগ, তিতিক্ষা, লজ্জা ; মাত্রাবোধ ; তাল লয় সব শিখতে হয়।'

'জন্ম দিলেই বাপ হওয়া যায় না। রাখ তোমার সাইকোলজিস্ট। অতি আদর আশকারা, রিরংসা এসব সংযত করে বাপের মত বাপ হতে হয়।'

'রিরংসা জিনিসটা কি ?'

'ডিকসেনারি দেখে নিও। শুভা থালাটা নিয়ে তুই এ ঘরে উঠে আয়। আর কাঁদতে হবে না, শুধু শুধু বকুনি খেয়েও মরতে হবে না। আয় আমার পাশে বসে খাবি আয়। আর একটু মাছ ঝালদে দোব। আয় উঠে আয়।'

'ওকে উঠতে হবে কেন? আমিই উঠে যাচ্ছি। আনওয়াণ্টেড এলিমেণ্ট আমি।

শচিন তেড়েফুঁড়ে উঠে পড়ল। চালতার অম্বলটা একটু চেখে দেখার লোভ ছিল। না খেয়েছে ভালই হয়েছে। অ্যাসিডে অ্যাসিড বাড়ে।

॥ দুই ॥

সোমবারটা এমনিই ভারি বিশ্রী। ব্ল্যাক মানডে। সকালে গা ম্যাজম্যাজ করে। বেরোতেও গড়িমসি হয়ে যায়। ট্রাম, বাস কেমন ঢিমে তালে চলে। সংখ্যাতেও কম মনে হয়। ক্যাটকেটে রোদ, ভিড়, ঠেলাঠেলি। তার ওপর কাল থেকেই অলকার সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ। কথাবার্তা সব তৃতীয় পুরুষে দেওয়াল কিংবা আলমারিকে উদ্দেশ্য করে হচ্ছে—'খেতে দিলে হয়, আণ্ডারওয়্যারটা আবার কোন্ চুলোয় ফেলেছে, মানিব্যাগটার পাখা গজাল না কি!' চুড়ির রিনিঝিনি মেশান অলকার সরোষ উত্তর, 'বল যে চুলোয় থাকে সেই চুলোতেই আছে, একটু চোখ মেলে দেখতে।'

'রুমালটা আবার দয়া করে কে হাওয়া করে দিলে?'

'কেউ হাওয়া করেনি, নিজের প্যাণ্টের পকেটটা ভাল করে দেখলেই পাওয়া যায়।'

'যাব্বাবা, একপাটি জুতো আবার কোথায় গেল?'

'কোথাও যায়নি, র‍্যাকের পাশে পড়ে গেছে। যেমন রাখার ছিরি!'

'ও, পড়ে গেলে তুলে রাখতে নেই? হাতে পক্ষাঘাত?'

'হ্যাঁ পাক্ষাঘাত। যেমন দেখাবে তেমনি দেখতে হবে। আর্সির মুখ দেখা।'

শচিন ঝুলতে ঝুলতে অফিসেব টেবিলে এসে বসেছে। ঘেমে নেয়ে, আধকপালে হয়ে, আধমবা অবস্থা।

ঢকঢক কবে এক গেলাস জল খেল। কাজ দেখলেই রাগ ধরছে। পেটটাও ভুটভাট কবছে। ঢেঁড়সের ঢেঁকুব উঠছে। অন্যদিন ড্রয়াবে একটা দুটো অ্যাণ্টাসিড থাকে, আজ তাও নেই। ভোগাবে। ঢেউ ঢেউ কবে আবও গোটাকতক ঢেঁকুব তুলল। মাথাটা বেশ জম্পেশ ধবেছে। ধববেই। মাথাব আব দোষ কি! কথায় বলে মুড়ি আর ভুঁড়ি। অম্বল হলেই মাথা ধববে। শচিন নাকের ওপব কপালেব কাছটা দু আঙুলে টিপে চুপ কবে বসে রইল। রাসকেল পেট, রাসকেল ডাক্তার। কোন অসুখই সারাবাব ক্ষমতা নেই, কেবল ফি গুনে দিয়ে যাও।

সুনীলবাবু পান চিবোতে চিবোতে বললেন, 'হল কি? এত করে বললুম খাবাব পব একটা কবে পান খাবেন, চুনে ক্যালসিয়াম, ভাল অ্যাণ্টাসিড, পানের রসে ক্লোরোফিল... ।'

'ধ্যাব মশাই ক্লোবোফিল, ক্যালসিয়াম, ভেতরটা চুনকাম করে দিলেও কিছু হবে না। সংসারটাই অম্বলে অম্বলে অ্যাসিড হয়ে গেছে।'

'চলুন আজ ডক্টব ঘোষের কাছে। আমিও যাব, একটা কেস আছে। আপনাব চেয়েও জটিল। সেও ওই স্ত্রীর সঙ্গে অবনিবনা।'

'হ্যাঁ যাব। আজই শেষ। হয় এসপার না হয় ওসপার।'

'আরে মশাই, অত সহজে হাল ছাড়েন কেন? কথায় বলে যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। নিন একটা পান খান। আজ আর চা খাবেন না, স্রেফ জল চালিয়ে যান। হাইড্রোপ্যাথি ইজ দি বেস্ট প্যাথি। এই সুরেন, শচিনবাবুর গেলাসটা ভবে দাও।'

টিফিনে সুনীলবাবু শচিনকে দেখিয়ে দেখিয়ে খাস্তা কচুরি খেলেন। হজম করায় মন? মনই লিভারকে নাচায়।

সুনীলবাবু বললেন, 'দেখেছেন কাণ্ড, জল পর্যন্ত যার পেটে

তলাত না, সে আজ প্লেন কচুরি নয় একেবারে খাস্তা কচুরি খাচ্ছে।'

শচিন ফাইল দেখতে দেখতে বললে, 'আমার বউটাকে বোবা আর কালা করে দিতে পারলে আমিও হেসে হেসে খাস্তা কেন কবিরাজী ক্যাটলেট খেতুম।'

॥ তিন ॥

ডক্টর ঘোষেব চেম্বার ফাঁকাই ছিল। থাকেও তাই। কাব দায় পড়েছে পয়সা খরচ করে ছত্রিশ গণ্ডা প্রশ্নের উত্তব দেবাব জন্যে সাধ করে আসতে। একটাই সুবিধে, বেশ আরাম করে বসাব জন্যে পুরু পুরু গদি-আঁটা ভাল ভাল চেয়াব আছে যা অন্য ডাক্তারখানায থাকে না।

ডক্টব ঘোষ সব শুনলেন। শুনেটুনে বললেন, 'পর্বত মহম্মদের কাছে না এলে মহম্মদকেই পর্বতেব কাছে যেতে হবে। দাম্পত্য জীবনের কয়েকটা বেসিক ডিসিপ্লিন আছে। সেই ডিসিপ্লিন মেনে চলাব ওপর শান্তি নির্ভব করছে। এই তো হালফিল একটা কেস ভালকরে দিলুম।'

শচিন বিশ্বাস হাবিয়ে ফেলেছে। কেসটা শোনাব কোন উৎসাহই নেই তাব। পয়সা খরচ করে যত বাজে গালগল্প শুনতে আসা। সুনীল-বাবুর খুব উৎসাহ, প্রশ্ন কবলেন, 'কি কেস?'

'জানলা খোলা। মাথার দিকেব জানলা খোলা নিয়ে চোদ্দ বছরের ঝামেলা, বদ হজম, নার্ভাস ব্রেকডাউন। স্ত্রী জানলা খুলে শোবেন, স্বামী বন্ধ করবেন। ইনি খোলেন তো উনি বন্ধ করেন। সাবা রাত ওই চলে। খোলা জানলার সামনে দাঁড়িয়ে ছিটকিনি ধরে দুজনের সারাবাত হাত কাড়াকাড়ি। ঘুমের বারোটা। প্রতিবেশীরা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন। প্রথম প্রথম মজা, পরে বিরক্তি, প্রতিবাদ। ভদ্রলোক কোথায় পড়েছেন মাথায় সরাসরি হাওয়া লাগলে সাইনাস হয়। সিটিং-এর পর সিটিং। কিছুই করতে পারি না। দুপক্ষই সমান।

গোঁ জেতে কি সাইকলজি জেতে! শেষে…।'

'শেষে কি হল?' সুনীলবাবু যেন রহস্য-গল্প শুনছেন।

'শেষে সাইকলজিব বাইরে যেতে হল।'

'কি রকম?'

'শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ। ভদ্রলোককে বললুম, একদিন আপনি সারাবাত জানলাটা খোলা রাখতে দিন। প্রযোজন হলে নিজে ম্যাঙ্কি-ক্যাপ পড়ে অলীক সাইনাস থেকে বাঁচুন। একটা দিন। ভদ্রলোক রাজী হলেন। ব্যাস হয়ে গেল।'

'কি হযে গেল?'

'চোদ্দ বছবেব ঝামেলা মিটে গেল। এখন স্ত্রী সবার আগে জানলা বন্ধ কবে দেন।'

'কেন?'

'সেদিন বাত হুটো নাগাদ অ্যাপ্রন পরে নিজেই গেলুম। রাস্তার ধাবে একতলাব ঘব। বকে উঠলুম। জানলা দিয়ে আমাব লম্বা হাতটা বাড়িযে ভদ্রমহিলাব চুল ধরে এক হ্যাঁচকা টান মেবেই দে দৌড়।'

সুনীলবাবু হি হি কবে হাসলেন। শচিনের হাসি পেল না। শচিনের তো জানলাকেস নয়। আরও ঘোরাল, জোরাল ব্যাপার।

সুনীলবাবুই শচিনেব মুখপাত্র। তিনি জিজ্ঞেস কবলেন, 'এঁর ব্যাপাবটা তাহলে কি হবে? এইভাবেই চলবে?'

'এঁর ব্যাপারটাব একমাত্র সমাধান প্রেম। প্রেম করতে হবে। প্রেম দিতে হবে।'

'এই বয়সে প্রেম? মেয়ে পাবে কোথায়? এখন মার্কেটে যে সব ছেলে ঘুবছে তাদের হাত থেকে মেয়ে বের করা শক্ত হবে না?'

'প্রেম মানেই কি পরকীয়া! নিজের স্ত্রীর সঙ্গেই প্রেম।'

শচিন এইবার লাফিয়ে উঠল, 'ওই বউয়ের সঙ্গে প্রেম? কারুর বাপের ক্ষমতায় কুলোবে না। সব সময় বাঘিনীর মত গর্জন করছে।

'বাঘিনীকেও পোষ মানাবার কায়দা আছে। সার্কাসের রিং-মাস্টার দেখেছেন তো? বউকে একটু তোয়াজ করবেন। রোজ গীতগোবিন্দ

পড়াবেন। মোলায়েম করে বলবেন, 'দেহি পদপল্লবমুদারম। আদর করে কখনও পিঠে, কখনও মাথায় হাত বুলিয়ে দেবেন, সুড়সুড়ি দিয়ে দেবেন। গালে দু-চারটে ঠোনা মারবেন। ট্যাবলেট-ম্যাবলেট নয়, নিয়ম করে রোজ একটা-দুটো চুমু খাবেন।'

'চুমু?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ চুমু, চুম্বন। ওর চেয়ে ভাল অ্যাণ্টাসিড আর কিছু নেই। না জানা থাকলে গোটাকতক ইংরেজী সিনেমা দেখে শিখে নেবেন। আমাদের দেশের দোষই হল, মেয়েদের শরীরের নীচের দিকেই আমাদের নজর। কিন্তু উর্ধ্বাংশটাই হল আসল। শুরু হবে ওপর থেকে। ডিভাইন লাভ, ডিভাইন লাইট ওপর থেকে ধীরে ধীরে নীচে নেমে আসে। প্রেম কি মশাই ধর্ তক্তা মার পেরেক। সব কিছুর একটা মেথড আছে, অ্যাপ্রোচ আছে। স্ত্রীর সঙ্গে প্রেমই হল বেস্ট প্রেম, সিকিওর প্রেম, খোঁটায় বেঁধে প্রেম। প্রেমের অবজেক্ট সহজে পালাতে পারবে না। ইঁদুর-কলে পড়ে গেছে। প্রথম প্রথম অসুবিধে হলে পরস্ত্রী ভেবে নেবেন। নিজেকে মনে করবেন কৃষ্ণ চলেছেন রাধার কাছে অভিসারে।'

'ইমপসিবল।'

'ওই তো দোষ? অহংটাকে খাটো করা যায় না? আত্মসমর্পণ সারেণ্ডার। বিল্বমঙ্গল যদি পেরে থাকে, হোয়াই নট ইউ! সিকির সিকি প্রেমই হল আমার প্রেসক্রিপসান। মাঝেমাঝে এদিক ওদিক তাকিয়ে বউয়ের মুখে একটা মিষ্টি গুঁজে দেবেন। ভাল শাড়ি পরিয়ে পার্কে পাশাপাশি বসে কোলের ওপর হাত নিয়ে খেলা করবেন। আঙুলের আংটি ঘোরাবেন। চীনেবাদাম, ঝালমুড়ি কিনে দেবেন। ফুচকা খাওয়াবেন। আড়ালে ঝোপঝাড় দেখে পাশাপাশি বসে মাথাটা কাঁধে হেলিয়ে দেবেন। ইডেনে গেলেই এ দৃশ্য দেখতে পাবেন। প্রথম প্রথম কপি করবেন। কপি করতে করতেই অরজিন্যালটি এসে যাবে। দিন কতক এইভাবে তোয়াজ করে দেখুন, শান্তি ফিরে আসবে, হজম শক্তি ফিরে আসবে; যৌবন ফিরে আসবে। মুখের ওই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত বুড়োটে ভাব

কেটে যাবে। যান, বি চিয়ারফুল ! মনে রাখুন, অম্বল আর বদহজমের দাওয়াই অ্যাণ্টাসিড নয়, প্রেম।'

দুজনে চেম্বার ছড়ে রাস্তায় নেমে এলেন।

সুনীলবাবু বললেন, 'তাহলে একটা গীতগোবিন্দ আর বিল্বমঙ্গল কিনে ফেলুন। নতুন জীবন আজই শুরু করুন। একটা কামসূত্রও সঙ্গে কিনে ফেলতে পারেন। ডাক্তাবে, ওষুধে তো বহু পয়সা দিলেন আরও কিছু না হয় এদিকে যাবে। দেখতে দোষ কি ? আচ্ছা আমি চলি। কাল দেখা হবে, গুডবাই।'

শচিন গুটিগুটি হাঁটা ধবল। আবার বাড়ি। আবার সেই দেওয়ালকে উদ্দেশ্য কবে ঠাবেঠোরে ছিটে গুলিব মত কথা ছুঁড়ে মাবা। মেয়েব সঙ্গেও কথা বন্ধ। এভাবে আব কতদিন চলবে প্রভু ! শচিন সেই অদৃশ্য প্রভুব কাছে পবামর্শ চাইল। কোথায প্রভু ! ঊর্ধ্ব-শ্বাসে মানুষ ছুটছে। ভ্যাঁক ভ্যাঁক কবে গাডি দৌডোচ্ছে। দুঃখী শচিনেব দিকে কারুব নজর নেই। অসাব সংসাব, নাহি পাবাবার। আচ্ছা দেখাই যাক না ডক্টর ঘোষেব নতুন দাওয়াই কাজে লাগিযে। অহং-এব ভালটাকে একটু নীচু করে স্ত্রীর উদাসীনতাব অগাধ জলে স্পর্শ করিযে স্নেহেব কণা কিছু তুলে আনা যায কি না। আমার বউ। আহা, আমার প্রেমের বউ। আহা, আমার ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো। বউকে স্নেহ কবার জন্যে শচিন নিজেকেই তোয়াজ কবতে লাগল। স্নেহকে প্রেমকে এখন দৃশ্যমান কবতে হবে। তেমন রেস্ত থাকলে একটা হীবেব আংটি কেনা যেত। তেমন বেস্ত থাকলে একটা শাড়ি। পকেট তো গড়ের মাঠ। মধ্যমাসে কেরানীর পকেটের আর কত জোর থাকবে। অলকা একসময় লড়াইয়ের চপ খেতে খুব ভালবাসত। বিয়ের পর প্রথম প্রথম নতুন বউকে সে কত খাইয়েছে। কচি কলাপাতা রঙের শাড়ি পরে হু-হা করে ঝালঝাল চপ খাবার সেই দৃশ্য হঠাৎ চোখের সামনে ভেসে উঠল। নাকের ডগায় শিশিরের দানার মত ঘাম। আয় পুরনো দিন ফিরে আয়। শূন্য এ ঘরে পাখি মোর ফিরে আয় ফিরে আয়।

॥ চার ॥

লড়াইয়ের চপ নিয়ে শচিন বাড়ি ঢুকছে। ঢুকতে ঢুকতেই শোবার ঘর দেখতে পাচ্ছে। জানলা খোলা। ফন ফন কবে পাখা ঘুবছে। পায়েব ওপর পা জড়িযে অলকা শুয়ে শুযে বই পড়ছে। ওবে আমার মহারানী রে ? বাস ঠেঙিয়ে ধস্তাধস্তি করে সারা দিনের পব একটা লোক বাড়ি ফিরছে কোথায় জানলার সামনে বিরহিণীর মত দাঁড়িয়ে থাকবে, হাসিমুখে এগিয়ে আসবে, বলবে, আহা তুমি এলে, বাছারে ? তা না উনি শুয়ে শুয়ে মৌজ কবে উপন্যাস পড়ছেন। ফায়ার। না না, আজ আব ফায়াব নয়, দাঁত চেপে সিজফায়াব।

শচিন একটু কাশল। অলকা বই থেকে চোখ না সবিয়ে শুয়ে শুয়েই বললে, 'শুভা দরজাটা খুলে দে।' ও ! শুভা দরজা খুলবে, আপনার হাতে কি পক্ষাঘাত ! এ যেন শচিন আসেনি, এসেছে কাজেব লোক। না, নো বাগাবাগি। শচিন ঢুকে পডল, 'একবাব দযা করে উঠে এসে এটা ধব না।'

দয়া করে শব্দটা না বললেই হত। সোজাসুজি বলা যেত, ওগো একবাব উঠে এস তো। যাক, মুখ ফসকে যা বেরিয়ে গেছে তা বেরিযেই গেছে।

'শুভা, কি ধবতে বলছে ধব তো !'

ও, তবু নিজেব ওঠা হল না।

'কি এমন ব্যস্ত, নিজে উঠতে পাবছে না।' অতিকষ্টে শচিন পবের শব্দ কটা ধরে রাখল—গতরে কি শুঁয়াপোকা ধরেছে !

ধপাস কবে বইটা পাশে ফেলে বেজার বেজার মুখে অলকা উঠে এল। 'কি, হল কি ?'

শচিন হাসিব রেখা টেনে পরম উৎসাহে বললে, 'গরম গবম—একেবারে গরম গবম লড়াইয়ের চপ।'

'কি হবে ?'

'কি হবে মানে ?'

'তুমি খাবে ? তোমার তো অম্বলের ব্যামো !'

'আমি কেন ? তুমি খাবে।'

'আদিখ্যেতা।'

'তার মানে ?'

'রোজই তো শুধু হাতে ঢোক, হঠাৎ আজ পীরিত উথলে উঠল কেন ?'

'ও পীরিত ? কোনদিন কিছু আনি না, না ?'

'মনে তো পড়ে না। তোমার চপ তুমি খাও।'

এই সময় শচিনের উচিত ছিল বউকে একটু সোহাগ করা, তার বদলে সে ঠোঙাটা মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে লাফিয়ে উঠল, 'রাবিস ! নৃশংস রাবিশ।'

'হ্যা রাবিশ !'

'অফকোর্স রাবিশ, হৃদয়হীন রাবিশ !'

'জানই তো। জেনে শুনে ঘাঁটাতে আস কেন ? কেঁচো খুঁড়তে গেলেই সাপ বেরোবে।'

'বেরোক। তাই বেরোক।' শচিন চপের ঠোঙায় মারল লাথি। ঠোঙা ছিঁড়ে সব চপ ছত্রাকার।

'পয়সা তোমার অনেক, মারো, মারো লাথি, কার কি ?'

'সংসারের মুখে লাথি।'

'নতুন কি, সে তো তুবেলাই চলছে।'

'তুবেলাই চলছে ?'

'হ্যাঁ, চলছে। বেরোতে লাথি, আসতে লাথি।'

'যেমন দেখাবে তেমনি দেখবে !'

'কি তোমাকে দেখান হয়েছে !'

'আদর করে চপ নিয়ে এলুম, দিলে ফেলে।'

'আমি ফেলে দিলুম, না তুমি ফেলে দিলে ?'

'ওই হল।'

'বিযাক্ত তেলেভাজা আজকাল কেউ খায় না। পারতে শ্যামাদির স্বামীর মত, ইলিশ নিয়ে, সিনেমার টিকিট কি থিয়েটারের টিকিট, কি কাশ্মীবে বেড়াতে যাবাব টিকিট নিয়ে বাড়ি ঢুকতে। বুঝতুম মুরোদ! আজ চোদ্দ বছবে একবাব চিড়িযাখানা দেখাতে পাবলে না! মেয়েটাকে প্রত্যেক বছব আশা দিযে দিযে বাখা। এ বছব হল না মা, আসছে বছর। সেই আসছে বছব চোদ্দ বছবেও এল না! এই তো মুবোদ।'

লড়াইয়ের চপের লডাই গড়াতে গড়াতে অনেক দূব গড়িযে গেল। শচিন পা থেকে জুতো দুপাটি খুলে ব্যাকেব দিকে ছুঁড়ে দিল। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে হিডহিড় কবে টেনে টুনে পা থেকে নাইলনেব মোজা খুলল। গা থেকে জামাটা খুলে চেয়ারে ছুঁডে মাবল। বুকপকেট থেকে একগাদা টুকরো-টাকবা কাগজ, খানকতক মযলা ময়লা নোট ছডিয়ে পড়ল মেঝেতে। থাক পডে। শ্যামাদির স্বামীব মত মুবোদ দেখাতে পারলে, অলকা সব তুলে গুছিযে গাছিয়ে বাখত।

অনেক বাতে বিছানায় চিৎ হযে শুয়ে শুযে শচিন নিজেকে শ্যামাদিব স্বামীব সঙ্গে মেলাতে বসল। প্রতিবেশী। দুবেলাই শচিনেব সঙ্গে দেখা হয়। লুঙ্গিটাকে উঁচু কবে পবে সকালে ঘোঁতঘোঁত করে বাজাবে ছোটেন। শচিন মাঝেসাঝে বাজারে যায। বোজ সকালে বাজার যাওয়া তাব পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার। নটা নাগাদ আদ্দির পাঞ্জাবি পরে ঘাডে একগাদা পাউডাব মেখে মুর্গীহাটায় ব্যবসা করতে যাওযা। হবে না, শচিনের দ্বারা হবে না। ও সাজে সাজা যাবে না মা। মোড়ের মাথায় পানবিড়িব দোকানে দাঁডিয়ে শ্যামাদিব স্বামী বেরোবাব সময এতখানি একটা হাঁ কবে দু খিলি পান একসঙ্গে মুখে পোবেন। তাবপব রিকশায় ওঠাব আগে কোনও দিকে না তাকিয়ে পচাৎ করে এক ধাপড়া পিচ ফেলেন। হবে না, শচিনের দ্বাবা ও কাজ হবে না। ছুটির দিন মেয়ের ঘাড়ে সংসার ফেলে দিয়ে বউ বগলে শ্যামাদির স্বামীর যে

কোনও সিনেমা বা থিয়েটারে যাওয়া চাই। যে কোন সিনেমা বা থিয়েটাব শচিনের পক্ষে সহ্য কবা শক্ত। হিন্দী ছবির ননসেন্স, বাংলা থিয়েটারের ক্যাবারে কোনও সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষের সহ্যশক্তির ওপব অত্যাচাব। শালীদের বাড়িতে এনে ছত্রিশবার বাজারে ছোটা, হই হই কবে হাসি-মস্করা, টাকাব শ্রাদ্ধ, শচিনের সে ক্ষমতাও নেই, রুচিও নেই। বোকা বোকা কথা বলে হ্যা হ্যা করে হেসে মেয়েদের মনোরঞ্জন করাব ক্ষমতা শচিনেব নেই। শান্ত মানুষ শান্তিতে থাকতে চায়। বউ পেয়েছে তাইতেই খুশি, শালাশালী নিযে ঢলাঢলির ইচ্ছেও নেই প্রয়োজনও নেই। এক মেয়েছেলেতেই কাহিল কাহিল অবস্থা আর মেয়েছেলেতে কাজ নেই। শ্যামাদির স্বামী ভাল শাড়ি দেখলেই বউযের জন্যে কিনে আনেন, কথায় কথায় গহনা গড়িয়ে দেন, দিতেই পারেন। ব্যবসাব পয়সা। টাটা আরও দেন, বিড়লা গোয়েঙ্কা দিতে পারেন। শচিনকে দিতে হলে চুবি করতে হবে।

অলকাব দিকে পেছন ফিবে শচিন চিৎ থেকে কাত হল। গায়ে হাত দিলেই খ্যাঁক কবে উঠবে। শ্যামাদির স্বামী না হতে পারলে অলকার সোহাগ শচিনেব ববাতে জুটবে না। যা হয়ে গেছে বিয়ের প্রথম চাব বছবেই খতম। বাকি দশটা বছব ভিয়েতনামের যুদ্ধ। চলছে তো চলছেই। কবে যে শেষ হবে! সেই সাহেব শিকারীর কথা মনে পড়ছে। দূর থেকে বাঘের গায়ে পিন ছুঁড়ে মাবেন। বাঘ ঘুমিয়ে পড়ে। তারপর বাঘেব মত হিংস্র জন্তুকে বেড়ালেব মত ন্যাজ ধরে টানতে টানতে নিয়ে আসেন। ওই রকম একটা অস্ত্র যদি শচিনের থাকত! রোজ বাড়ি ঢোকার আগে জানলাব বাইবে থেকে অলকাকে টিপ করে মারত। ব্যাস বাঘিনী ঘুমে ন্যাতা। সংসাব শান্ত। ডক্টর ঘোষ! ডক্টব ঘোষ কি করবেন? প্রেম! প্রেম নয়, শচিনকে হতে হবে শ্যামাদির স্বামীর মত

অনেক ভেবে শচিনের মনে হল, একটা কাজ সে করতে পারে—চিড়িয়াখানা। অগতির গতি চিড়িয়াখানা। শীত আসতে অনেক দেরি,

তবু চিড়িয়াখানা। চলো চিড়িয়াখানা। বাঘিনীকে বাঘ দেখাও, সিংহ দেখাও, আইসক্রিম খাওয়াও ট্যাক্সি চাপাও। সেই রেশে যদি কিছুদিন শান্তি পাওয়া যায়। আর দেরি নয় তাহলে। কালই। শুভস্য শীঘ্রং। কাল অফিস না গিয়ে চিড়িয়াখানা। অনেক ছুটি পাওনা। ছুটি তো সে নেয়ই না। ছুটি নিয়ে বাড়িতে থাকলেই তো অশান্তি !

একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছে শচিন শেষ বাতের দিকে ঘুমিযে পড়ল।

॥ পাঁচ ॥

ঝনঝন করে বাসন পডাব শব্দে শচিনেব ঘুম ভেঙে গেল। বেশ বেলা হয়েছে। অলকা মেয়েকে বলছে, 'থাক ডাকতে হবে না, আক্কেলটা দেখাই যাক না। কখন ওঠে, কখন বাজাব হয়, কখন খাওয়া হয়, কখন অফিস যাওয়া হয়। আমার কি ? আমি ভাত নামিয়ে বসে থাকি।'

শুভা বলছে, 'না মা, বাবাকে ডেকে দি। তা না হলে এমন তাড়াহুড়ো করবে সকলেরই মেজাজ খারাপ হয়ে যাবে।'

'কোন দরকাব নেই। আমি বাথরুমে ঢুকছি, তুই একটু পবে ভাতের হাঁড়িতে কেবল এক ঘটি জল ঢেলে দিস।' শচিন বিছানা থেকে লাফিয়ে নামল। মবেছে, অলকা বাথরুমে ঢুকলে পাক্কা এক ঘণ্টা। তার আগেই মুখটা ধুতে হবে। শচিন ঘব থেকেই চিৎকাব করে বলল, 'শুভা আমি উঠেছি।'

'উঠেছ বাবা !'

'হ্যাঁ মা, উঠেছি।' শচিন বাইরে এল। আহা কি সুন্দব প্রভাত ! 'চট করে মুখটা ধুয়ে আসি। অলকা, অলকা তুমি চা চাপাও।'

উঃ, কতদিন পরে বউকে নাম ধবে ডাকা হল ! দাঁতে বুরুশ ঘষতে ঘষতে শচিন ভাবল, অলকা নামটা ভারি সুন্দর। অলকানন্দা। চেহারাতেও একসময় বিউটি ছিল। মনটা যদি একটু বিউটিফুল হত ! কাদের বাড়ির রেডিও থেকে অতুলপ্রসাদের গান ভেসে আসছে,

প্রভাতে যারে নন্দে পাখি।

হাত মুছতে মুছতে শচিন বেরিয়ে এল, 'কই, চা হয়েছে অলকা ?' কোনও দিকে না তাকিয়ে শচিন বসার ঘরের দিকে এগোল। কেমন যেন লজ্জা লজ্জা করছে। অলকা, অলকা, একটু যেন তোয়াজের গলা। চায়ে চিনি গুলতে গুলতে মা মেয়েকে ফিসফিস করে বললে, 'কি ব্যাপার!' মেয়ে ঠোঁট উলটে বোঝাতে চাইল, তোমাদের ব্যাপার তোমরাই জান, আমি তো সবে এসেছি। জ্ঞান হয়েছে মাত্র কয়েক বছর।

শুভা চা নিয়ে এল। শচিন কাগজ দেখছিল।

'তোর মাকে ডাক্ তো।'

অলকা নববধূর মত পায়ে পাযে বসাব ঘবে এল। শাড়ির সামনেটা ভিজে। হাত মুছেচে। রাতেব বাসী চুল, শবীর উষ্কখুষ্ক। অনেকদিন পরে শচিন অলকাকে ভাল কবে দেখছে। আগের অমন সুন্দর মুখটা সংসাবের আঁচে যেন পোড়া-পোড়া হযে গেছে।

'শোন, আজ আব বেবোব না।'

অলকা উদাস গলায় বললে, 'বেবিও না।'

'কেন বেবোব না বল তো ?'

'কি জানি ?'

'আজ আমরা চিড়িয়াখানায় যাব। ডিম নিয়ে আসছি। ভাতে ভাত, ডিম সেদ্ধ, মাখন।'

'হঠাৎ চিড়িয়াখানায় ?'

'অনেক ছুটি পাওনা, মাঝে মাঝে একটু আউটিং ভাল।'

'তোমার ডাক্তারবাবুর প্রেসক্রিপশান বুঝি।'

'আরে না না। জীবনটা বড একঘেয়ে হয়ে গেছে। সংসার, অফিস, অফিস, সংসার।'

'তোমার মেয়েকে নিয়ে যাও।'

'আর তুমি!'

'আমার রোজ যা তাই। হাঁড়ি ঠেলা কাজ, সেই হাঁড়িই ঠেলে

যাই সারাজীবন।

'এদিকে সরে এস।'

'বল না!'

শচিন চেয়ার ছেড়ে উঠে এল। অলকার চেয়ে বেশ কিছুটা লম্বা। এদিক ওদিক তাকাল। ধারে-কাছে শুভা নেই।

শচিন অলকার গলাটা জড়িয়ে ধবে চুক কবে গালে একটা চুমু খেল।

অলকা চমকে উঠেছে। 'সাতসকালে এ কি অসভ্যতা।'

শচিনের নিজেকে মনে হল ইংবেজী ছবির হিরো। ডক্টর ঘোষ বলেছেন, অ্যান্টাসিড নয়, চুমু। বেশ লাগল। অনেকদিন পবে, যদিও ভয়ে ভয়ে আলগোছে।

'যাও, রেডি হয়ে নাও। তোমার চুল বড তেলচিটে হয়েছে। একটু স্যাম্পু করো।' অলকা চলে গেল।

শচিন শুনতে পাচ্ছে মা মেযেকে বলছে, 'কি বে ভাতেব তলা ধবে যায়নি তো মা।'

ওষুধ ধবেছে। মা বেবিয়েছে মুখ দিয়ে। জয় গুরু। জয় গুরু। ডক্টর ঘোষ কি বলবেন? তাব নিজের লেখাপডাও কম না কি। নিজেই একটা মেণ্টাল হসপিট্যাল খুলতে পাবে। এই তো সেদিন এরিক ফ্রমের 'দি আর্ট অফ লাভিং-এ পডছিল, লাভ ইজ অ্যান অ্যাকটিভ পাওয়ার ইন ম্যান, এ পাওয়ার হুইচ ব্রেকস থ্রু দি ওয়ালস…।'

॥ ছয় ॥

সেই বলে না, সোনার মোহর মাটি চাপা থাকলে পেতলের মত ম্যাড়মেড়ে হয়ে যায়। একটু ঘষলেই আবার চকচকে। অলকার রূপটা আজ ক্যায়সা খোলতাই হয়েছে। কোথায় গেলেন শ্যামাদির স্বামী! আসুন একবার দেখে যান।

শুভা মায়ের হাত ধরে, শচীনের কাঁধে জলের বোতল। বাসের জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবে। না পেলে ট্যাক্সি। আজ আর কৃপণতা নয়। অলকা বললে, 'কিছু লজেন্স কিনে নিলে হত।'

'ঠিক বলেছ।'

রাস্তার ওপরেই স্টেসেনারি দোকান। শচীন বোধহয় একটু অন্যমনস্ক ছিল। লক্ষ্যই করেনি বেগে একটা গাড়ি আসছে। রাস্তা পার হবার জন্যে একেবারে গাড়ির মুখোমুখি। অলকা একটান মেরে শচীনকে সরিয়ে আনল। গাড়িটা থামেনি। একটা গালাগাল ছুঁড়ে দিয়ে বিদ্যুৎ বেগে চলে গেল। অলকার হ্যাঁচকা টানে শচীন প্রায় তার বুকের ওপর এসে পড়েছে। কাঁধ থেকে জলের বোতল ছিটকে রাস্তায়। শুভা মা বলে চিৎকার করে উঠেছে। একটুর জন্যে শচীন বেঁচে গেল। অলকা হাঁফাচ্ছে। দুজনেই দুজনের দিকে তাকিয়ে আছে স্থির দৃষ্টিতে। অলকা কাঁদোকাঁদো গলায় বললে, 'রাস্তা পার হবাব সময় দেখবে তো। এখুনি একটা কাণ্ড হয়ে যেত।' অলকা কেঁপে উঠল। শুভা এসে শচীনের হাত ধরেছে, যেন হাত ধরে থাকলেই বাবা চিরকাল থাকবে।

অলকা বললে 'চল ফিরে যাই। বাধা পড়ে গেছে। তোমার শরীর কাঁপছে।'

'ধুর ফিরব কেন? ফাঁড়া কেটে গেল।'

'তাহলে চিড়িয়াখানায় গিয়ে কাজ নেই। চল কালীঘাটে যাই। অনেকদিন ধরে মা টানছেন।'

কালীঘাট। শচীন একটু ঘাবড়ে গেল। ভিড় ঠেলাঠেলি, পাণ্ডা। মায়ের কথা উঠলে, না বলা যায় না। হিন্দুর ছেলে।

'বেশ তাই চল! বাসের চেষ্টা করে লাভ নেই। ট্যাক্সি ধরি।'

'অনেক নিয়ে নেবে।'

'তা নিক, রোজগার তো খরচের জন্যেই।'

দুদিকের দু'জানলার ধারে মা আর মেয়ে, মাঝখানে শচীন। বেশ লাগছে। সত্যিই বেশ লাগছে। হু হু করে গাড়ি ছুটছে।

শুভার নানা প্রশ্ন। এটা কি, ওটা কি ? অলকা বললে, 'একদিন আমাকে নিউ মার্কেটটা দেখাবে ?'

'আজই দেখিয়ে দোব ফেরার পথে।'

'একটা জিনিস কিনে দেবে ?'

'কি ?'

অলকা শচীনের কানে ফিসফিস করে সাধের জিনিসের নাম বললে, অন্য পাশ থেকে শুভা বললে, 'কি বাবা ?' অলকা শচীনের উরুতে চিমটি কেটে সাবধান করে দিলে।

শচীন বললে 'তোর জন্য কাঁচের চুড়ি।'

শুভা খুব খুশি, 'তাহলে মাকেও কিছু কিনে দিও, তোমার জন্যেও কিছু কিনো।'

শচীন তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল অখুশি মুখগুলো কেমন খুশি খুশি হয়ে উঠেছে।

॥ সাত ॥

তেমন ভিড় নেই মন্দিরে। বেশ ফাঁকা ফাঁকা। পুজোর নৈবেদ্য নিয়ে তিনজনে পাশাপাশি দাঁড়িয়েছে মায়ের দিকে মুখ করে। পূজা নিচ্ছেন, প্রসাদ দিচ্ছেন। তাঁর কি মনে হল, অলকার কপালে গোল একটা সিঁদুরের টিপ পরিয়ে দিলেন। মুখে ঘামতেল কপালে লাল টিপ। শচীনের মনে হল কুসুমডিঙ্গার দিন হোমের আগুনে অলকার মুখটা এইরকম দেখতে হয়েছিল। তখন শচীনের সঙ্গে বাঁধা ছিল গাঁটছড়া। অতীত যেন ফিরে এসেছে বর্তমানে। কান পাতলে কি সানাইয়ের সুর শোনা যাবে ?

অলকার চোখে জল। শচীনের মনে হল পাথরে জল ঝরছে।

'তুমি কাঁদছ কেন ?'

'আমার ভীষণ বাঁচতে ইচ্ছে করছে, আমি মরতে বড় ভয় পাই।'

'মরার কথা আসছে কেন ?'

'আসছে। তোমাকে আমি বলিনি। আমার ভীষণ একটা অসুখ করেছে।'

'কি অসুখ?'

'টিউমার।'

'টিউমার? কোথায় টিউমার?'

'এই যে মাথার মাঝখানে।'

অলকা মাথাটা নিচু করল। কপালের সামনে থেকে চুল দু'ভাগ করে সিঁথি চলে গেছে মাথার মাঝখান পর্যন্ত। ঘাড়ের কাছে খোঁপা টলবল করছে। শচীন মাথার মাঝখানে হাত দিয়ে দেখল গোল মস্ত একটা কি উঁচু হয়ে উঠেছে। গুলির মত হাতে চাপ দিলে পিছলে এপাশ ওপাশ করছে।

'তুমি বলনি তো?'

কি বলব, বলে কি হবে? তোমাকে না বলে একদিন ডাক্তার-বাবুকে দেখিয়েছিলাম। বললেন, 'জায়গাটা খারাপ। ভাল করে দেখতে হবে।'

অন্য দর্শনার্থীদের ঠেলা খেয়ে তিনজনকে সরে আসতে হল। একপাশের চাতালে বসে শচীন জিজ্ঞেস করলে, 'কি হয়?'

'যন্ত্রণা হয়। মাঝে মাঝে মাথাটা মনে হয় চুরমার হয়ে যাচ্ছে। চোখেও যেন কম দেখছি আজকাল। কান দুটোও কেমন হয়ে যাচ্ছে। আমি বেশি দিন বাঁচব না গো। তোমাকে অনেকদিন জ্বালিয়েছি, এইবার তোমার ছুটি। আবার যদি বিয়ে কর, একটু দেখে শুনে কোরো, শুভাটাকে যেন যত্ন করে।'

মায়ের কোলে মুখ গুঁজে শুভা ফ্যাঁস-ফোঁসা করে উঠল। শচীন চুপ। ভেতরটা বড় নাড়া খেয়েছে।

রাত নিঝুম। শচীন মেটিরিয়া মেডিকা খুলে বসেছে। টিউমার, টিউমার। কত পাতায়। হোমিওপ্যাথিতে টিউমার সারে। বাইরের ভেতর থেকে একটা কাগজ বেরোল। অনেকদিন আগে খবরের কাগজে দেখে বলে রাগ করে একটা বিজ্ঞাপন লিখেছিল—

স্বামী চাই

মধ্যবয়সী বিবাহিতা মহিলার জন্য পার্টটাইম স্বামী চাই।

দুপুরে বিকেলে প্রেম করতে হবে, তোয়াজ করতে হবে, বেড়াতে নিয়ে যেতে হবে। সব খরচ আসল স্বামীর। এমন কি অবাঞ্ছিত পিতৃত্বের দায়িত্ব। লিখুন বক্স নং…

শচীন কাগজটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে জানলা দিয়ে উড়িয়ে দিল। অন্ধকারে সাদা সাদা কাগজের টুকরো হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে উড়ছে। আলো পড়ে কোনওটা চিকচিক করছে। যেন অজস্র বাদুলে পোকা।

দেওয়ালের ব্র্যাকেটে মা কালীর সিঁদুর মাখা ছবি। মায়ের পায়ের তলায় কালীঘাট থেকে আনা প্রসাদী জবা ফুল জিভের মত লকলক করছে। সবাই ঘুমোচ্ছে। শচীন একা জেগে। কেমন যেন ভয় ভয় করছে। তোমার সংহারের রূপ আমি আর দেখতে চাই না।

অনেক অনেক দিন আগে শচীন একটা গল্প পড়েছিল 'স্রোতের ফুল'। সেই গল্পের সঙ্গে একটা ছবিও ছিল। নির্জন নদীর ঘাটে একটি বালিকা একের পর এক জলে ফুল ভাসিয়ে চলেছে। গল্পটা তার এখনও মনে আছে। অনেকে বলেন, ঈশ্বর এক মহান শিশু, বসে আছেন বিরাট সিন্ধুর তীরে আপন মনে। একটি একটি করে জীবনের ফুল ভাসিয়ে চলেছেন। ভাসতে ভাসতে সুদূরে চলেছে, কখনও একটি, কখনও পাশাপাশি দুটি তিনটি। এইভাবে চলতে চলতে স্রোতের টানে আবার একা। মিলন, বিচ্ছেদ, সঙ্গ, নিঃসঙ্গ সবই স্রোতের খেলা। অলকার জন্যে অসম্ভব করুণায় শচীনের মনটা কানায় কানায় ভরে গেল। একটা জীবন এসেছিল আর একটা জীবনের সঙ্গে মিলতে। একটু স্নেহ, একটু ভালবাসা, একটু নির্ভরতা, এ আর এমন কি ধন-দৌলত যা দেওয়া যায় না। কি তুচ্ছ ভাত, ডাল, তরকারির স্বাদ বিস্বাদ নিয়ে কলহ। কিসেরই বা অহঙ্কার।

বই বন্ধ করে শচীন বিছানায় গেল। অলকার ব্রহ্মতালুর ফুলো জায়গায় একটা আঙুল রাখল। অলকা খুব ঘুমোচ্ছে। বাইরে তো বেরোয়না, ঘোরাঘুরিতেখুবই ক্লান্ত। অলকা ঘুমোলেও টিউমারটা ঠিকই জেগে আছে। দেওয়াল ঘড়ির টিকটিকের সঙ্গে সমান তালে দপ দপ করে চলেছে। আমি বাড়ছি, আমি বাড়ছি। কি বলতে চায়? তোয়াজে সারতেও পারি আবার মরতেও পারি।

ভালো বাসা মোরে ভিকিরি করেছে

ওই যে মোড়ের মাথায় হলুদ রঙের বাড়িটা দেখছেন, ওই বাড়িতে আমি থাকি। আমি থাকি, আমার বউ থাকে, আমার এক ছেলে আর মেয়ে থাকে। ছেলে বড় আর মেয়ে ছোট। আমি ইচ্ছে করলে আমার বাড়ির বাইরে একটা মার্বেল ফলক লাগাতে পারি; তাইতে লেখাতে পারি 'প্ল্যানড্ ফ্যামিলি'।

আমি ইচ্ছে করলে আমার পরিবারের সভ্যসংখ্যা আরো অনেক বাড়াতে পারতুম। সে ক্ষমতা আমার ছিল। সাহসে কুললো না, ফলে, হাম দো, হামারা দো। একটা কথা চুপি চুপি বলে রাখি, এখন যা বাজার পড়েছে, তাতে যে কোনও লোকের তিনটে ছেলে হলে ভাল হয়। একজন মাস্তান হবে, আর একজন হবে নেতা, আর একজন পুলিস। একেবারে আদর্শ পরিবারের কাঠামো। হেসে খেলে রাজত্ব করে যাও। ব্যক্তিগত সম্পত্তির অভাব হলেও জাতীয় সম্পত্তির অভাব নেই। পার্কের রেলিং খুলে বেচে দাও। ট্রেনের কামরা থেকে আলো, পাখা, গদি আপন ভেবে খুলে নিয়ে এসো। চারদিকে নানা রকম কনস্ট্রাকসান হচ্ছে, প্রচুর মালপত্র পড়ে আছে রাস্তাঘাটে। একটু কষ্ট করে তুলে আনো। এনে আবার সেইখানেই ফিরিয়ে দাও। একেই বলে লেনদেন। জমি কেন, বাড়ি কর, গাড়ি কর। ফুরফুরে নেশা কর। এদিক সেদিক যাও। শহরে আবার

বাঈজী-কালচার ফিরে আসছে। ওড়াও, ওড়াও, দু হাতে কারেন্সি নোট ওড়াও। তা, এই নয়া বাতাসে পাল তুলতে পারিনি আমি। আমার পালে সেই পুরনো বাতাস। ধর্ম নিয়ে, আদর্শ নিয়ে এক বিশ্রী অবস্থা। লোভ আছে, সাহস নেই।

আমি আমার বউকে ভীষণ ভয় পাই। সব আদর্শবাদী স্বামীই পায়, আমি একটু বেশি পাই; কারণ আমি ঝগড়াঝাটি ভীষণ অপছন্দ করি। আমি মনে করি কোনও ভদ্রলোকের, স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করা উচিত নয়। আর স্ত্রী আর হেডমিস্ট্রেসে খুব একটা তফাত নেই। সব স্বামীই স্ত্রীদের ছাত্র। কত কি শেখার আছে! আর সেই শিক্ষা তো স্ত্রীর পাঠশালাতেই হয়। আমার স্ত্রী এই এতদিন পরেও প্রায়ই বলে, 'কবে যে তুমি একটু মানুষ হবে?'

'আমি এখন তাহলে কী?'

স্কুলে শিক্ষকরা চিরকাল বলে এসেছেন, 'এমন সিনসিয়ার গাধা খুব কম দেখা যায়।'

আমার বউ স্পষ্ট মুখের ওপর বলে, 'তুমি একটা অমানুষ।' অর্থাৎ জন্তুর জান্তব গুণাবলী চোলাই করে ঈশ্বর আমাকে মানুষের বোতলে পুরে পৃথিবীতে ঠেলে দিয়েছেন। আর আমার স্ত্রী দয়া করে সেই বোতলটিকে তুলে নিয়েছে। কত বড় উদারতা। এই উদারতার জন্যে চিরকাল আমাকে কৃতজ্ঞ থাকতে হবে। 'সিট ডাউন', বললে বসতে হবে। 'গেট আপ', বললে উঠতে হবে।

আমি আমার ছেলেমেয়েদের কোনওভাবেই জানতে দিতে চাই না, যে আমি প্রেম করে বিয়ে করেছি। প্রেম বাঙালীর রক্তে হেমোগ্লোবিনের মতো মিশে আছে। নারী জাতীর প্রতি প্রেম। বিয়ের সময় আমরা যে পণ চাই, বিয়ের পরে বধূ নিগ্রহ করি, কখনও পুড়িয়ে মারি, বা সিলিং-এ ঝুলিয়ে দিই, সেটা স্ত্রীর প্রতি বিদ্বেষ নয় শ্বশুর মশাইকে ঘৃণা। অধিকাংশ শ্বশুরই পাকা ব্যবসাদার। কৃপণ। হাত দিয়ে জল গলে না। চোখের চামড়া নেই। ধুরন্ধর প্রকৃতির ব্যক্তি। সুন্দর সুন্দর মেয়ের পিতা হয়ে বিয়ের বাজারে

লাঠি ঘোরাতে চান।

আমি একটু বোকা ধরনের উদার প্রকৃতির মানুষ, তাই ঠকে মরেছি। আমার ভায়েরাভাই, যে আমার বৌয়ের বোনকে বিয়ে করেছে, সে পাকা ছেলে। আমার শ্বশুরমশাইয়ের কানটি মলে কম বাগিয়েছে! ভাবলে মনটা কেমন হয়ে ওঠে। একই বউকে তো দ্বিতীয়বার আর বিয়ে করা যায় না। যা হয়ে গেছে, তা হয়ে গেছে। পস্তে লাভ নেই। ভালবাসার পলস্তারা দিয়ে সব মসৃণ করতে হবে। ভালবাসা জিনিসটা ভোরের শিশিরের মতো। সংসার সূর্যে নিমেষে উবে যায়।

আমার হলুদ রঙের একতলা বাড়ি। সবে হয়েছে। এখনও অনেক কাজ বাকি। এই বাড়িই আমার বাঁশ হয়েছে। আমার জ্ঞানী বউয়ের পরামর্শে, সব বেচেবুচে, ধার দেনা করে তৈরী হয়েছে ইটের খাঁচা। এখন বাজার করার পয়সা জোটে না। ভিখিরির অবস্থা। অফিস থেকে লোন নিয়েছিলুম। কাটতে শুরু করেছে। মাইনে হাফ হয়ে গেছে। অথচ সংসার খরচ কোনও ভাবেই কমানো যাচ্ছে না। এই নিয়ে স্বামী স্ত্রীতে ঘন ঘন বাজেট অধিবেশন হয়ে গেছে। কোনও দিক থেকেই কোনও সুরাহা হয়নি। আমরা তো আর স্টেট নই যে মদের ওপর, কি ডিজেলের ওপর, কি সিগারেটের ওপর, কি গমের ওপর ট্যাক্স বসিয়ে দেবো! এ হল ফ্যামিলি। একটাই রাস্তা, খরচ কমানো।

দুধের খরচ কমানো যাবে না। ছেলে মেয়ের হেলথ খারাপ হয়ে যাবে। ওরাই তো আমাদের ভবিষ্যৎ। দেশেরও ভবিষ্যৎ। ঠিক মতো লালনপালন করতে পারলে কত কি হতে পারে। এদেশে এখনও কেউ আইনস্টাইন হয়নি, রাসেল হয়নি। এদেশে অ্যাব্রাহাম লিংকনেরও খুব প্রয়োজন। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি একেবারে যাচ্ছেতাই। সারা ভারতে রাজনীতির চোলাই তৈরি হচ্ছে। চতুর্দিকে আড়ং ধোলাই শুরু হয়েছে। সারা বিশ্ব হিংসায় ভরে গেছে, একজন যীশু এলে মন্দ হয় না। আমার শিশুটিও যীশু হতে পারে। কে কি হবে,

বলা তো যায় না। আমার বউ অবশ্য সন্দেহ করে,'তোমার মতপিতার সন্তান কতদূর কি করতে পারবে সন্দেহ আছে। গাছ অনুযায়ীই তো ফল হবে।' আমি ভয়ে বলতে পারি না যে, 'তুমি তো জমি। বীজ ধারণ করেছিলে। সেই জমিতেও তো আমার সন্দেহ। বীজের দোষ না জমির দোষ।' সাহস করে বলি না। বললেই দাঙ্গাহাঙ্গামা বেঁধে যাবে। মেয়েদের সঙ্গে ঝগড়ায় আমি পারবো না; কারণ আমার মেমারি তেমন ভালো নয়। মামলা আর বউয়ের সঙ্গে ঝগড়ায় 'পাস্ট রেফারেন্সের' খুব প্রয়োজন হয়। দশ বছর আগে এক বর্ষার রাতে আমি কি বলেছিলুম, আমার বউয়ের মনে আছে। লিভিং রেফারেন্স ম্যানুয়েল। মাঝে মাঝে মনে হয় মেয়েদের স্মরণ-শক্তি বেশি, না বিয়ে হলেই স্মরণশক্তি খুলে যায়! আমার তো কালকের কথা আজ মনে থাকে না। টেপের মতো সব ইরেজ হয়ে যায়।

বেশ, দুধ কমানো যাবে না। বোতলের সাদা জল, পলিথিনের ব্যাগে ভরা থলথলে সাদা জলে বাঙালীর ধৃতি, পুষ্টি, মেধা। সারা পরিবারে ভাগ-বাঁটোয়ারায় আধ কাপ মাথাপিছু পেটে না গেলে মনস্তাত্ত্বিক দুর্বলতা দেখা দেবে। গ্যাসের খরচ কমানো যাবে না। গ্যাস দিয়ে আর গ্যাস নিয়েই তো আমাদেব জীবন। চাবি ঘুরিয়ে জ্বালতে জ্বালতেই বেশ কিছুটা বাতাসে পাখা মেলে উড়ে যাবে। সারা বাড়ি খুশবুতে ভরে যাবে। হাতের কাছে সব গুছিয়ে নিয়ে রাঁধতে বসার নির্দেশ থাকলেও সম্ভব হবে না। সেইটাই আমাদের চরিত্র। বিদ্যুতেব বিল উত্তরোত্তর বাড়বে বই কমবে না। লোক-লৌকিকতা যা ছিল তাই থাকবে। শিক্ষার খরচ দিন দিন বাড়বে। প্রতিটি বিষয়ের জন্যে এক একজন গৃহশিক্ষক। তা না হলে পরীক্ষায় গোল্লা। অশ্রু বিসর্জন করে, নাকে কেঁদে লাভ নেই। যে খেলার যা নিয়ম। খরচ কমাবার কোনও রাস্তা নেই। শুধু বেড়ে যাও, ছেড়ে যাও, উড়িয়ে যাও, পুড়িয়ে যাও।

ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি, ওয়েস্ট নট ওয়ান্ট নট। অপচয়

বন্ধ করো, অভাব হবে না ; কিন্তু স্বভাব যাবে কোথায়। মহিলাদের স্বভাব হল, তাঁরা অন্যকে উপদেশ দেবেন, সেই উপদেশের সিকির সিকি নিজেদের জীবনে পালন করবেন না। আমার স্ত্রী পাশের বাড়ির বউটিকে উপদেশ দেন, 'স্বামী অফিস থেকে ফেরা মাত্রই অমন মেজাজ দেখাও কেন। আগে আসতে দাও, বসতে দাও, শান্ত হয়ে চা-টা খেতে দাও। তারপর যা বলার বলো। বলবে বইকি। স্বামীকে বলবে না তো কাকে বলবে। পৃথিবীতে ওই একটাই তো লোক। জীবন সাথী।'

এই উপদেশ আমি নিজের কানে শুনেছি। কিন্তু আমার বেলায় ঠিক উল্টোটাই হয়। আপনি আচরি ধর্ম,এই নীতিবাক্যটি ভদ্রমহিলা হয়তো বহুবার শুনেছেন ; মগজে তেমন ছাপ ফেলেনি। ঢোকার দরজার মুখে একটা পাপোশ আছে। সেইখান থেকেই শুরু হয়। 'কী হোলো। পাপোশটা কী জন্যে রাখা হয়েছে। ছাপান্ন টাকা নগদ দাম দিয়ে কেনা হয়েছে কী কারণে! তোমার হাইজাম্প প্র্যাকটিশ করার জন্যে। ওই নোংরা জুতো নিয়ে ছাগলের মতো লাফিয়ে আমার এমন সুন্দর মোজাইক মেঝেতে দাগ ফেলে দিলে! জানো না মোজেকের মেঝে কী সাংঘাতিক সেনসিটিভ। একবার দাগ ধরে গেলে সহজে উঠতে চায় না। অকজ্যালিক অ্যাসিড ঘষতে হয়, মোমপালিশ করতে হয়। আর রাস্তার জুতো নিয়ে ভেতরেই বা আসা কেন? ন্যাস্টি হ্যাবিট!'

আমারও মেজাজ ঠিক থাকে না। জ্যাম ঠেঙিয়ে, ধুলো ঘাম ডিজেলের ধোঁয়া গায়ে মেখে, ঘাড়ে পিঠে সহযাত্রীদের রদ্দা খেয়ে, ময়ান দিয়ে ঠাসা লুচির ময়দার তালের মতো বাড়ি ফিরে দরজার মুখ থেকেই শুরু হলে, কার ভাল লাগে। আমার মোজেক। তোমার মোজেক মানে। পুরো প্রোডাকসনটাই তো আমার। চিত্রনাট্য, পরিচালনা,সংগীত, গীত রচনা সবই তো আমি করেছি। ভাদ্র-মাসের রোদে পোস্টাপিসের পিওনের ছাতা মাথায় দিয়ে মিস্ত্রী খাটিয়েছি। নাক দিয়ে সিমেন্ট টেনেছি। পা দিয়ে মশলা দলেছি। জোগাড়ের

অভাব হয়েছে যেদিন, ক্যানেস্তারা ক্যানেস্তারা জল ঢেলে ইট ভিজিয়েছি। পয়সা ছিল না; মোজেক ঘষাবার মেশিন আনতে পারিনি, নিজেই হাঁটুগেড়ে বসে পাথর দিয়ে ঘষে দানা বের করেছি। সেই থেকে আমার হাঁটুতে কড়া, কোমরে সায়টিকা। ভাদ্রের রোদে পুড়ে জণ্ডিস। সেই থেকে চোখ দুটো ঘোলাটে হলুদ। আর এখন, সেই সাধনার পীঠস্থানে জুতোসুদ্ধ পা রেখেছি বলে ধাঁতানি খেয়ে মরছি।

বেশ চড়া গলাতেই বলতে হয়, 'জুতো তাহলে রাখবো কোথায়। মাথায়।'

'মাথায় তো রাখতে বলিনি; বাইরের সিঁড়ির একপাশে রাখতে পার।'

'তিনদিন আগে আমার নতুন কোলাপুরি একটা কুকুরে মুখে করে নিয়ে গেছে।'

'গাছে তুলে রাখো।'

জমিটা যখন কিনি, তখন সেখানে একটা ফলসা গাছ ছিল। গাছটাকে কায়দা করে বাঁচানো হয়েছে। সেই গাছে জুতোটাকে ঝোলাবার পরামর্শ। গাছ থেকে ফল পাড়ে। ফলের বদলে রোজ সকালে জুতো পাড়বো। বলা যায় না ডাল থেকে একটা সুদৃশ্য সিকা ঝুলিয়ে দিলে। এ তো কায়দার যুগ। রোজ জুতো সিকেয় তুলে বাড়ি ঢুকতে হবে।

আমার স্ত্রীর একটা ম্যানিয়া মতো হয়ে গেছে। ঘুরছে, ফিরছে, ঘাড় কাত পাশ থেকে আলোর বিপরীত দেখছে মেঝেতে দাগ পড়েছে কি না। পড়লেই স্পেস্যাল ন্যাতা দিয়ে, জল দিয়ে, লিকুইড ডিটারজেণ্ট দিয়ে ঘষে ঘষে পরিষ্কার করছে। আমারও রেহাই নেই। বসতে দেখলেই তেলেবেগুনে জ্বলে উঠছে, 'কি বসে বসে বাসী খবরের কাগজ পড়ছ? যাও না, সিঁড়ির ধাপ আর মেঝের স্কার্টিংগুলো একটু পরিষ্কার করো না।'

বাড়ি করবার পর একেই তো আমার চেহারাটা অষ্টাবক্র মুনির

মতো হয়ে গেছে তার ওপর চব্বিশ ঘন্টা এই অত্যাচার। দেয়ালে পিঠ রেখে বসা যাবে না। দেয়ালের রঙ চটে যাবে। মাথার পেছন লাগানো যাবে না। ছোপ ধরে যাবে তেলের। বাথরুম থেকে বেরিয়ে পাপোশে পনের মিনিট পা ঘষতে হবে। জল থাকলেই ঝকঝকে মেঝেতে দাগ পড়ে যাবে। কোথা থেকে এক জোড়া ছেঁড়া মোজা যোগাড় করে দিয়েছে, সেই মোজা পরে রোজ সকালে সারা বাড়ির মেঝে পরিষ্কার করো। টুথব্রাশ দিয়ে গ্রিলের ভাঁজ থেকে ধুলো ঝাড়ো। ঘাড় উঁচু করে ত্যাখো সিলিং-এর কোথাও ঝুল ধরেছে কিনা। এই সব করতে করতেই বেলা কাবার। না পড়া হয় সকালের কাগজ। না হয় ভাল করে খাওয়া। কোনওরকমে নাকে মুখে গুঁজে ছোট অফিস। প্রায়ই দাড়ি কামানো হয় না। খোলতাই চেহারায় এক মুখ কাঁচাপাকা দাড়ি। লোকে জিজ্ঞেস করে, 'কি হয়েছে বলুন তো আপনার?'

'ভাই, বাড়ি হয়েছে।'

'বাড়ি হলে এই রকম হয় বুঝি।'

'অনেকে টেঁসে যায়, আমি তো তবু বেঁচে আছি।'

একদিন সকালে ঢোকার মুখের মেঝেটা খারুয়া দিয়ে মুছছি আর পাশে হেলে হেলে দেখছি দাগ পড়েছে কি না, এমন সময় আমার প্রতিবেশী আশুবাবু এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি রে বিশুবাবু আছেন?'

আমার নামই বিশুবাবু। ভদ্রলোক চিনতে পারেননি। আমি বললুম, 'বাজার গেছেন।'

'এলে তোমার বাবুকে বোলো দেখা করতে। শুধু বলবে ইনকামট্যাক্স।'

আমি ন্যাতা ফেলে তড়াক করে লাফিয়ে উঠলুম। 'ইনকামট্যাক্স মানে?'

আশুবাবু থতমত খেয়ে বললেন, 'আরে আপনিই তো বিশুবাবু। কি করছিলেন অমন করে, এমন অদ্ভুত পোশাকে?'

'হাউস মেনটিনেনস। মেঝে পালিশ না করে নিজেকে পালিশ করুন। চেহারার একি দশা! পায়ে মোজা পরেছেন কেন? শরীর গোলমাল?'

'না, না এটা আমার স্ত্রীর ব্যবস্থা। মেঝেতে দাগ পড়বে না।'

'কত রঙ্গই জানেন। কত রকমের পাগল আছে এই ছুনিয়ায়। যাক, কাজের কথাটা বলে যাই। বাড়ি তো করলেন, ডিক্লারেশান দিয়েছেন ইনকাম ট্যাক্সে?'

'সে আবার কি?'

'সে আবার কি, বুঝিয়ে ছেড়ে দেবে। বাড়ি তো করলেন, টাকাটা এল কোথা থেকে? কত টাকার সম্পত্তি? ঠিক ঠিক জবাব দিতে না পারলে হাতে হ্যারিকেন।'

'কেন, স্ত্রীর কিছু গয়না বেচেছি। ধার দেনা করেছি। কিছু জমেছিল। সব ঢুকিয়ে দিয়েছি ইটের পাঁজায়।'

'দেখে মনে হচ্ছে লাখ ছুয়েক গলে গেছে। মোজাইক মেঝে। সেগুন কাঠের জানলা-দরজা। বরফি গ্রিল। কত গয়না বেচলেন মশাই! ধারই বা পেলেন কোথায়! এই বাজারে সংসার চালিয়ে জমেই বা কত?'

'মনে হচ্ছে, আপিনি আমাকে সন্দেহ করছেন?'

'সন্দেহ নয়, সাবধান করতে এলুম বন্ধু হিসেবে। ওই যে মোড়ের মাথায় ক্ষীরঅলা বাড়ি করেছে। ওই যে সিলভার গ্রে রঙের বাড়িটা। কোন হিতৈষী বন্ধু একটি চিঠি ছেড়ে দিলে। ব্যাস্ কেঁচো খুঁড়তে সাপ।'

'এইরকম চিঠি ছাড়ে না কি?'

'ছাড়বে না? বাঙালীরা কত সমাজসচেতন জানা আছে আপনার। এই যে হালফিল কালীপুজো গেল; কত আনন্দ দিয়ে গেল বলুন তো! ছেলেরা অষ্টপ্রহর গান শোনাবার ব্যবস্থা করেছিল। সারাদিন, সারারাত মুহুর্মুহু বোমা ফাটিয়ে শরীরের রক্তসঞ্চালন বাড়িয়ে দিয়ে গেল। ছু-চারজন টেঁসেও গেল মানে মোক্ষলাভ হল।

ছোটকথা কানে তোলার উপায় ছিল না। আবগারি বিভাগের রোজগারও বেড়েছিল। সকলেই মা মাহা করছে। কান-খাড়া করে আবার শুনলুম, মা নয় বলছে মাল। ইয়াং জেনারেশন একেবারে টং। বিসর্জনের প্রসেসন যাচ্ছে। একজন ধাক্কা মেরে নর্দমায় ফেলে দেয় আর কি। দেখি কেউ প্রকৃতিস্থ নয়। সকলের মুখেই চুল্লুর গন্ধ। সমাজসচেতন না হলে পারত এসব।'

'আপনিও তো বাড়ি করেছেন?' ডিক্লারেশন ফাইল করেছেন?

'আমার বাড়ি তো আমি আমার বউয়ের নামে করেছি। চালাক লোকেরা তাই করে।'

আশুবাবু দুর্ভাবনা ঢুকিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। এক কাপ পানসে চা নিয়ে দেওয়ানি খাশ'-এ পা ছড়িয়ে বসলুম। আগে একশো টাকা কেজির ফুরফুরে গন্ধঅলা চা নিয়ে বসতুম। সেই চা এখন চল্লিশ টাকায় নেমেছে। না আছে লিকার, না আছে ফ্লেভার। বাড়ি করে 'পপার' হয়ে গেলুম। এখন দুম করে ভারী রকমের কারোর অসুখ করলে বিনা চিকিৎসায় মরবে। সামনেই আসছে বিয়ের মাস। গোটা তিনেক নিমন্ত্রণ পত্র আসবেই। বাডিতে দেবার মতো যা ছিল সবই দেওয়া হয়ে গেছে। মাছের তেলে মাছ ভাজার আর উপায় নেই।

সেই হলুদ বাড়ি থেকে কিছুক্ষণ পরেই অষ্টাবক্র মুনির মতো একটি লোক বেরিয়ে এল। হাতে একটা ঢাউস ব্যাগ। পকেটে দশটি মাত্র টাকা। সেই টাকায় আলু হবে, কপি হবে, মাছ হবে, মাংস হবে। মাথাধরার ওষুধ হবে। গায়ে মাখা সাবান হবে। দাড়ি কামাবার ব্লেড হবে। আমার বউ বলে বাড়িঅলাকে একটু কষ্ট করতে হয়। ট্যানা পরে ঘুরতে হয়। ভোলামহেশ্বরের কথা ভাবো।

উলটো দিক থেকে বিকট শব্দ করে একটা মোটরবাইক আসছে। দেখেই বুকটা ধক করে উঠল। গ্রিলঅলা এখনও অনেক টাকা পাবে। মোটাসোটা, গাঁট্টাগোঁট্টা এক ভদ্রলোক। আমাকে জমিয়ে একটা ঘুসি মারলে আর তিন দিন উঠতে হবে না। আমি

সঙ্গে সঙ্গে পেছন ফিরে দাঁড়ালুম। পাওনাদারের কাছে পেছনও নেই সামনেও নেই। মোটরবাইক ঠিক আমার পেছন এসে থেমে পড়ল। ভুটভুট, ভুটভুট মধুর শব্দ। সেই শব্দ ছাপিয়ে গলা, 'আপনার কাছেই যাচ্ছি। আজ কিছু দেবেন তো?'

ঘুরে দাঁড়াতেই হল। ভেবেছিলুম সকালেই পাওনাদারের মুখ আর দেখবো না। বললুম, 'বাজারে যাচ্ছি। আপনি যান। ওসব এখন আমার স্ত্রীই দেখছেন।'

মোটরবাইক ভটভটিয়ে বাড়ির দিকে ছুটল। কি হবে তা জানি না। মোড়ের কাছাকাছি এসে দেখি একটা সাইকেল ঢুকছে। মরেছে। ইটগোলার মালিক। বেশ ভালই পাওনা। নগদে শুরু করেছিলুম। ধারে ফিনিশ করেছি।

'এই যে বিশুবাবু, আপনার ওখানেই যাচ্ছি। আজ কিছু দেবেন তো?'

'চলে যান। সব আমার স্ত্রীর কাছে।'

সাইকেল চলে গেল। মনে পড়ল অল রোড লিডস টু রোম। হরেনের পান বিড়ির দোকানের কাছাকাছি আর এক পাওনাদার। ফটিকবাবু। আমার কনট্র্যাকটর। নীলরঙের সার্টের বুকপকেটটা ডিমভরা ট্যাংরা মাছের পেটের মতো, প্রায় ফাটোফাটো অবস্থা। আমি জানি ওই পকেটে কি আছে। সেই মারাত্মক লোমওঠা কুকুরের মতো মলাটওলা মাঝারি মাপের নোটবুকটা আছে। যার পাতায় পাতায় বর্গমিটার আর ঘনমিটারের হিসাব। আমাদের মতো চিৎ হয়ে শোয়া কুঁজোদের বধ করবার ব্রহ্মাস্ত্র খাতা খুলেই বলবেন, লিনট্যাল, ছাজা, সানশেড, বিম, পিলার, ঢালাই বাবদ, একটু থামবেন, তারপর এমন একটা অঙ্ক বলবেন, শোনামাত্রই শুয়ে পড়তে হবে।

ফটিকবাবু বললেন, 'আপনার কাছেই যাচ্ছি। আজ কিছু দেবেন তো। কিছুটা ক্লিয়ার করুন। আর কতদিন ফেলে রাখবেন?'

একগাল হেসে বললুম, 'যান, বাড়িতে যান না। এখন থেকে

সবই আমার স্ত্রী দেখবেন।'

ফটিকবাবু নাচতে নাচতে চলে গেলেন। দু কদম এগোতে না এগোতেই, প্যাটেলের ছেলে। জানলা, দরজা, ফ্রেম, এইসব সাপ্লাই করেছিল। কত দেওয়া হয়েছে, আব কত যে পাবে, আমার কোনও ধারণা নেই। তাকেও হাসিমুখে বাড়িমুখো করে দিলুম।

বাজার প্রায় এসে গেছে। শীতের মুখ, মানসচক্ষে দেখতে পাচ্ছি টাটকা কপি,নতুন আলু, গলদা চিংড়ি। বুকপকেটে ময়লা একটা দশ টাকার নোটমাত্র সম্বল। হাতে বিশাল এক ব্যাগ। প্রথমে কিছু ইট-পাটকেল ভরব। তারপর এক কিলো আলু, এক ফালি কুমড়ো, দু বাণ্ডিল নটেসাক কিনে, একজোড়া ফুলকপি হাত দিয়ে ধরব। ধরে আদর করে ছেড়ে দোব। তারপর মাছের বাজারে গিয়ে একটা বড়সড় মাছের খুব কাছে গিয়ে, ফিসফিস করে বলব. 'অহো কি সুন্দর।' তারপর তার চিকন শরীরে একটু দীর্ঘশ্বাস মাখিয়ে ফিরে আসব। আসার পথে পঞ্চাশগ্রাম কাঁচালঙ্কা কিনবো। কিনবো টাকায় ছটা পাতি লেবু।

সব শেষ করে বাড়িমুখো হতে গিয়েও থেমে পড়লুম। বাড়িতে তো এখন যাওয়া যাবে না। সেখানে তো চলেছে পাওনাদারদের দক্ষযজ্ঞ। ঘুপচিমতো একটা চায়ের দোকানে ঢুকে এক কাপ চায়ের হুকুম দিলুম। অনেকক্ষণ পরে একটা সিগারেট ধরাবার সুযোগ হল। যখন-তখন ফুসফাস সিগারেট খাবার মতো সঙ্গতি আর নেই। ভালো বাসা মোরে ভিকিরি করেছে।

চায়ে চুমুক দিয়ে কাপটা সবে নামিয়েছি, দোকানদারকে পয়সা দিতে দিতে মোটামতো শ্যামবর্ণ এক ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, 'বিশ্বনাথবাবুর বাড়িটা কোথায়?'

'কে বিশ্বনাথ?' দোকানদান যেন বিরক্ত হলেন।

'নতুন বাড়ি করেছেন। এই কাছাকাছি কোথাও।'

আমি আর থাকতে না পেরে জিজ্ঞেস করলুম, 'বিশ্বনাথবাবুর বাড়ি খুঁজছেন কেন?'

'আপনি চেনেন ?'

'কেন খুঁজছেন বলুন ?'

'আমি ইনকামট্যাক্সের লোক।'

সঙ্গে সঙ্গে দোকানদার বললেন, 'জানন তো বলে দিন না।'

'আমিই সেই অধম। আমার নাম বিশ্বনাথ বোস।'

ভদ্রলোকের মুখ দেখে মনে হল অনেকদিনের এক পলাতক আসামীকে ধরে ফেলেছেন।

'বিশ্বনাথ বোস ? চলুন বাড়ি চলুন। কথা আছে।'

বাড়ির বাইরে তখন সব সার দিয়ে বসে আছে। গ্রিলঅলা, কাঠঅলা, ইট-চুন-সুরকিঅলা, কনট্র্যাক্টার। তাদের সামনে দাঁড়িয়ে আমার স্ত্রী। মুখে মোনালিসার হাসি। ইনকামট্যাক্সের ভদ্রলোককে সামনে খাড়া করে দিয়ে বললুম, 'এই নাও, আর একজন। ইনি আরও বড় পাওনাদার, পাওনাদারদের মহেশ্বর, খোদ ইনকামট্যাক্স। যথাবিহিত সম্মানপুরঃসরঃ নিবেদনমিদম।'

আমার স্ত্রী আরও মধুর হেসে বললেন, 'ভালই হয়েছে। এসেছেন। ইনকামের জীবন্ত সব সোর্স এই সামনে লাইন দিয়ে বসে আছেন। আর আমি মা দুর্গা। কেউ আমাকে গ্রিল দিয়েছেন, কেউ দিয়েছেন কাঠ। কেউ দিয়েছেন বাঁশ। কেউ দিয়েছেন চুন সুরকি। এই আপনার সোর্স। সবাই এখন গলায় গামছা দিয়ে পাক মারছেন। আপনিও মারুন।'

আমার সেই মুহূর্তে মনে পড়ল গানের লাইন—ওই দেখা যায় বাড়ি আমার, চৌদিকে মালঞ্চ নয়, পাওনাদারের বেড়া।

ওরে বাবারে বিশ্বকাপ ক্রিকেট এসে গেছে। সারা বিশ্বে এব চেয়ে বড ঘটনা আর কি আছে। বন্যা, খরা, পতনমুখী ডলার, ধসেপড়া শেয়ারবাজার, উর্ধ্বমুখী পাউণ্ড, বেকার সমস্যা, উধাও সরষের তেল, নিকমহারাম নুন, মহার্ঘ আলু, কোনও কিছুই কিছু নয়। ক্রিকেট।

আমাব সাদাকালো টিভি মাঝরাতের এক ঘণ্টা আগে তিনবার ঝিলিক মেরে একটা চিকুনির মতো চিত্র বুকে ধারণ করে চোখ মারতে লাগল। সবাই এক বাক্যে বললেন, মায়েব ভোগে। পরেব দিন মোটব সাইকেল ভটভটিয়ে বদ্যি এলেন। পেছন দিকের কুঁজ খুলে, ইনস্টেসটাইন পর্যবেক্ষণ করে বললেন, 'পিচকার টিউব খতম হো গিয়া।'

আমি সংশোধন করে দিলুম, 'পিচকার নেহি, পিকচার।'

তিনি বললেন, 'ওই হল। সাবা দিন রাত যে ভাবে পিচকিরিব মতো প্রোগ্রাম ছিটোয়। কলকাতা হল তো দিল্লি, দিল্লি গেল তো বাংলাদেশ। নিন অনেক টাকার ধাক্কা। কি করতে চান বলুন?'

সঙ্গে সঙ্গে পরিবাব-পরিজনের উল্লাসের চিৎকার, 'বলো হ্যারি বিদেয় করো, বিদেয় কবো, লে আও কলার।'

আমাদের বাড়িতে যে মহিলা কাজ করে, সে বললে, 'ভগমান যা করেন মঙ্গলের জন্যে। ওই যে সুনীলবাবুর বাড়িতে করাল এনেছে, কি সুন্দব, হলদে মানুষ, সবুজ মানুষ সব নেচে নেচে বেড়াচ্ছে।'

যেখানে যা ছিল সব তুলে, বউয়ের আংটি বেচে দোকানে গেলুম। হরেক রকমের যন্ত্র। 'কি নেবেন, অস্কার, নেলকো, ওয়েস্টন, বি পি এল, পি এইচ একস, অজন্তা, ওনিডা। ওই দেখুন সব লাইন লাগিয়ে বসে আছে।'

'দাম?'

'নয়, দশ, বারো, পনের, বাইশ, চব্বিশ, খুচরোটা আর বললুম না।'

'বলতে হবে না, হার্টে যা চোট লাগার লেগে গেছে। বলুন কোনটা কেমন? টিভি কেনা নয় তো,বিয়ে করা। একবারই ঢুকবে। মরে বেরোবে।'

ভদ্রলোক বিভিন্ন পাত্রীর গুণাবলী ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। এর একটা স্পিকার। ওর ছুটো, ওর চারটে। চতুর্মুখ, চারদিকে শব্দ ছড়াবে। বাথরুমে বসেও চিত্রহার শুনতে শুনতে তালে তালে…।'

'সমঝ গিয়া, সমঝ গিয়া।'

'এব মেটাল বডি, ওর মোল্ডেড বডি। এটার চ্যাপ্টা, ফ্ল্যাট টিউব, ওর কালো টিউব। এটার সঙ্গে রিমোট কন্ট্রোল, খাটে বসে কন্ট্রোল করতে পারবেন। এর রিমোট কন্ট্রোলের এত শক্তি যে, পাশের থেকে কন্ট্রোল করতে পারবেন। এটার ভেতর মেমারী ফিট করা। হাত-পা লাগানো, নিজে নিজেই, চ্যানেল, রঙ সব খুঁজে নেবে।'

'মানুষের মতো?'

'মানুষের বাবা।'

'তা ঠিক। পরিবারে টিভিই তো সব। বাপ মা ভেসে গেছে।'

'হ্যাঁ এটার স্ক্রিনে চ্যানেল, কালার প্যাটান নাচানাচি করে।'

ওরই মধ্যে একটিকে তুলে নিয়ে এলুম। সঙ্গে সঙ্গে নাচানে বন্ধুবান্ধব প্রতিবেশীরা এসে বলতে লাগলেন, এ কি করলে, এটা আনলে কেন? ওটা আনা উচিত ছিল, যার বিজ্ঞাপনে কাঁচ ফেটে একটা গিরগিটি মানুষ বেরিয়ে আসে।

তিন রাত ঘুম হল না। ছুশ্চিন্তা, ছুর্ভাবনা, মনোবেদনা, হতাশা, আফসোস। ফুলশয্যা হয়ে গেছে, আর উপায় নেই। ফেরত দেওয়া যাবে না। ছটা বেড়ালের সবচেয়ে ডাকাবুকোটা একদিন সাহস করে শ্রীদেবীর মুখে আচমকা থাবা মেরে অ্যান্টি গ্লেয়ার স্ক্রিনে ছোট্ট একটা আঁচড় কেটে দিয়েছে।

হুকুম হল, কালার টিভি তো রঙচটা ঘরে থাকতে পারে না। সেই একবার বিয়ের সময় জানলা দরজা, দেওয়ালে রঙ পড়েছিল। শেষ কো-অপারেটিভে যে কটা টাকা পড়ে ছিল, তুলে এনে দেওয়ালে অফ হোয়াইট ইমালশান চাপালুম। ওদিকে শ্রীযুক্ত ডালমিয়া ইডেনের চেহারা ফেরাচ্ছেন, এদিকে আমি আমার ঘরের। বায়না হল, 'তিনটে গার্ডেন চেয়ার আনতে হবে। একটায় তুমি, একটায় তোমার বাবা আর একটায় আমার বাবা। বেশ হাত পা খেলিয়ে বসবে! এক-আধ ঘণ্টার ব্যাপার নয় তো! সকাল পৌনে নটা থেকে বেলা সাড়ে চারটে। আর জানালায় একটু ভাল জাতের পর্দা।'

যা কষ্টেসৃষ্টে জমেছিল, সব শেষ করে, বিশ্বকাপের প্রস্তুতিপর্ব চুকল। একটু গাঁইগুঁই করে বলতে গিয়েছিলুম, মেয়ের বিয়ে ছেলের এডুকেশান। এক দাবড়ানি, 'মেয়ের বিয়ে তোমাকে দিতে হবে না। প্রেম হবে, প্রেম। ছেলের এডুকেশান, ছেলে নিজেই করে নেবে।' সেই প্রথম শুনলাম, চেষ্টায় কিছু হয় না, সবই মানুষের ভাগ্য।

দেখতে দেখতে নিম্নচাপের ঝোড়ো বাতাসের মতো ক্রিকেট-ফিভার; ক্রিকেট টিম এসে গেল। পটাপট বই বেরোতে লাগল। খবরের কাগজের ভেতর কাগজ ঢুকল। জ্ঞান বাড়তে লাগল হুহু করে। কাগজ আর ম্যাগাজিনে ছাপা খেলোয়াড়দের ফুলসাইজ প্রিন্ট এ-দেয়ালে, সে-দেয়ালে সাঁটা হয়ে গেল। এ-দেয়ালে হিরো গাওস্কার ও-দেয়ালে হিরো ইমরান। পাশের দেয়ালে কপিল হাঁ। পেছনের দেয়ালে, ভিভ রিচার্ডস আকাশ দেখছেন। মা দুর্গা, মা কালী, নারায়ণ সব ভেসে গেল। মেয়েরা দেখি সময় পেলেই ইমরানের ছবির দিকে গদগদ দৃষ্টি। ইমরানের মতো রমণীমোহন আর নাকি দ্বিতীয় নেই। জ্যোতিষীরা খেলোয়াড়দের কোষ্ঠী নিয়ে বিচারে বসে গেলেন। গাওস্কার বিদায় নেবেন। ইমরানও ব্যাট ছেড়ে দেবেন। দুই উপমহাদেশেই ক্রিকেট প্রেমীরা হায় হায় করছেন। রেশনের দোকানে রেপসিডের খোঁজে গেলুম, মালিক তেল ভুলে গাওস্কারকে নিয়ে পড়লেন। প্রশ্ন করলেন, 'গাওস্কার না কি

ব্যাঙাচির সঙ্গে কথা বলে না ?'

'ব্যাঙাচী ? সে আবার কে ?'

পরে বুঝলাম বেঙ্গসরকারের কথা বলছেন। ডাক্তারবাবু ব্লাড-প্রেসারের যন্ত্রে ফ্যাঁস ফ্যাঁস করে প্রেসার তোলেন, আর বলেন, 'ইণ্ডিয়া পারবে ?' প্রেসার ছেড়ে দিয়ে আবার তোলেন, আবার প্রশ্ন করেন, 'অস্ট্রেলিয়া শুনলুম ফুল স্ট্রেংথে আসছে না।' এদিকে রক্ত আটকানো হাত টনটনিয়ে আঙুলে প্যারালিসিস হয়ে যাবার দাখিল। আধ ঘণ্টার ফ্যাঁসফোঁসের পর জিজ্ঞেস করলুম, 'প্রেসার কত দেখলেন ?'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'প্রেসার তো দেবেই। পাকিস্তান ছেড়ে কথা বলবে। এবারের ওয়ার্লডকাপ ওরাই না নিয়ে যায়।'

'আমি আমার প্রেসারের কথা বলছি। পাকিস্তানের প্রেসার নয়।

'আপনার আবার প্রেসার কি ? অ-আপনার প্রেসার দেখছিলুম না। দাড়ান।' আবার ফ্যাঁস ফ্যাঁস শুরু হল।

সেলুনে চুল কাটতে গিয়ে ঘাড়ের খানিকটা কপচে গেল। যিনি চুল কাটছিলেন, ভারতের জয়পরাজয় নিয়ে এত ভেবে পড়লেন যে আমার ঘাড়ে ক্ষুরের এক কোপ বসিয়ে দিলেন না, সেইটাই আমাব মহাভাগ্য।

গঙ্গায় স্নান করতে করতে এক বৃদ্ধা বললেন, 'দেশে আবার সত্যযুগ ফিবে এল।'

'কেন ঠাকুমা ?'

'ওদিকে টেলিভিসানে রামায়ণ শুরু হয়ে গেছে। সুগ্রীব আর বালির ন্যাজ দেখেছ ? অত লড়াই কবলে, তাও ধনুকের মতো ওপর দিকে খাড়া হয়েই রইল। খুলে পড়ল না। আর এদিকে কলকাতায় ভীষ্মের নামে কাপ হচ্ছে—ভীষ্মকাপ।'

পাড়ার ছেলেরা এসে বললে, 'দাদা কিছু চাঁদা ছাড়ুন দেশের স্বার্থে।'

'তার মানে ?'

'ক্রিকেট স্বস্ত্যয়ন ; যজ্ঞ করব আমরা। উদ্দেশ্যটা, গাওস্কারকে কিছুক্ষণ পিচে আটকে রাখা দৈববলে। গুরু আমাদের খেলে ভাল, হেভি রেকর্ড ; কিন্তু ওই এক দোষ, হয় শূন্য করবে না হয় সেঞ্চুরি। গোটা-কতক ক্যাচ ফসকে দিতে পারলেই মার হাব্বা। সেই যে সেঁটে যাবে, চার আর ছয়ের ফুলঝুরি। আর আমাদের গণেশ আর কার্তিক।'

'সেটা কী ?'

'অ জানেন না বুঝি, গণেশ হলেন কপিলদেব আর শ্রীকান্ত হলেন কার্তিক। গণেশের সব ভাল, প্রোবলেম হল, চল কোদাল চালাই, ভুলে মানের বালাই।'

'তার মানে ?'

'মানে, ওস্তাদ মাঝে মাঝে সব ভুলে যায়. এলোপাথারি এমন ব্যাট চালায়, যেন ঝোপে কাটারি চালাচ্ছে। লাগে তুক, না লাগে তাক। ব্যাটে বলে হল তো ছয় নয় তো মিডেল ইস্ট্যাম্প উড়ে গেল। আমরা যজ্ঞ করে একটা আকন্দের মূল মাদুলিতে ভরে কপিলদেবের কাছে পাঠিয়ে দোবো।'

'আকন্দেয় মূল কেন ?'

'আকন্দের আঠা, পিচে একেবারে সেঁটে যাবে। বল একেবারে লাল পান্তুয়ার মত টপাটপ স্টেডিয়ামে গিয়ে পড়বে। ছয় কেবল ছয়। সব নয়ছয় করে দিয়ে কাপ ঘাড়ে নাচতে নাচতে বেরিয়ে আসবে। শ্যাম্পেনের ফোয়াররা।'

'তা কত দিতে হবে ?'

'বেশি চাপ দোবো না। একটা হাফ পাত্তি ছেড়ে দিন।'

পঞ্চাশ টাকা পকেটে পুরে দেশহিতৈষীরা হাওয়া হলেন।

কাগজে খবর বেরলো ওয়ার্লডকাপের খেলা দূরদর্শন নাকি দেখাবে না। ভারতসরকার, পাকসরকার, দূরদর্শন কর্তৃপক্ষে জট পাকিয়ে গেছে। মহা কেলেঙ্কারি ! আমার আয়োজন ভেস্তে গেল

বুঝি। পর্দা, রঙিন টিভি গোল-বাগান চেয়ার। কর্তা ব্যক্তিরা কয়েকদিন মাছ খেলানোর মতো আমাদের খেলিয়ে সিদ্ধান্তে এলেন, খেলা দেখানো হবে। সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে সত্যনারায়ণ লেগে গেল। পাঁচ সের দুধের সিন্নি। লক্ষ্মীর ভাঁড় ভেঙে বাতাসা এসে গেল। লণ্ড্রি থেকে কাপড়জামা ডেলিভারি নেওয়া হল না পয়সার অভাবে।

অফিসে একটু অস্বস্তি। ছুটি কি ভাবে মিলবে। আমি তো আর মন্ত্রী নই যে টেবিলে টিভি ফেলে দেশসেবা আর ক্রিকেটসেবা একই সঙ্গে চালাবো। রথ দেখা কলাবেচার মতো। অফিস স্কুল নয় যে বগলে রসুন চেপে জ্বর নিয়ে আসব। অথচ ইণ্ডিয়া অস্ট্রেলিয়ার প্রথম খেলাটা দেখা দরকার। ইণ্ডিয়া কি ফর্মে ফিল্ডে আসছে জানা চাই। অফিসের কেউই তেমন ঝেড়ে কাশছে না। সকলেই সকলের দিকে মিটিমিটি তাকাচ্ছে। পুরো ডিপার্টমেণ্ট তো আর খালি করে খেলা দেখা যায় না। একজন বললেন, 'কেন যায় না, ক্রিকেট আগে না অফিস আগে।' আমাদের আবার কাগজের অফিস। 'সবাই ছুটি নিলে কাগজ বেরোবে কি করে?' সহকর্মী চুপসে গেলেন। টেবিলে আঙুল ঠুকতে থাকলেন, তাল দেখে মনে হল, মনে মনে গাইছেন, স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে, কে বাঁচিতে চায়। অফিসে অনেকেই চেয়ারে বসে অজ্ঞান হয়ে যান। ডাক্তার এসে বলেন মাইলড্ স্ট্রোক। এক মাস বেড রেস্ট। সন্দেহবাদীরা বলে, স্ট্রোক নয়, আপওয়ার্ড প্রেসার অফ উইণ্ড। আহা সেইরকমই একটা হোক না আমার। পুরো পৃথিবী থেকে বিদায় নয়. একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি।

আমার এখন উইণ্ড চাই। মাদ্রাজী দোকানে গিয়ে দুটো বোম্বাই পোট্যাটো চপ খুব খানিকটা চাটনি দিয়ে খেয়ে এলুম। চড়িয়ে দিলুম দু গেলাস জল। অপেক্ষা করে বিকেল গড়িয়ে গেল। কোথায় কি। পেটটা কিছুক্ষণ বেলুনের মতো ফুলে রইল। সাতটার সময় সব তলিয়ে গেল। মধ্যবিত্তের হার্ট আর লিভার দুটোই বিলিতি মাল-সহজে টসকাস না। ধরলে বাতে ধরবে, না হয় ক্যানসার!

যা থাকে ববাতে। প্রথম দিনের খেলাটা মেরে দিলুম। কান্নার টিভির উদ্বোধন হল বলা চলে। ঘর একেবারে ভরে গেছে। যে জীবনে ক্রিকেটব্যাট চোখে দেখেনি সেও এসে বসেছে। এক ভীষণ ভক্ত, তিনি মনে মনে জপ করে চলেছেন। আমার হাতে রিমোট কণ্ট্রোল। দুই বৃদ্ধ পাশাপাশি বসেছেন। আমার এক প্রতিবেশী. তিনি পুরোহিত, সামনের সারিতে বসেছেন। আদুর গা। পরনে ধুতি। পইতেতে বাঁধা চাবি। চেয়ারের পাশে দুলছে। একটা বাচ্চা বেড়াল থাবা মেরে মেবে সেটাকে শিকার ভেবে কাবু করার চেষ্টা করছে।

বৃদ্ধরা থেকে থেকে বলছেন, 'একটু অ্যাডজাস্ট করো, একটু অ্যাডজাস্ট করো। খুব ব্রাইট হয়ে গেছে।'

সঙ্গে সঙ্গে আমার রিমোট কণ্ট্রোল সক্রিয়। গাওস্কর বেশ ভালই পেটাচ্ছেন। তবে শান্তিতে বসার উপায় নেই। অনবরতই সদরে কড়া নড়ে উঠছে। অফিসে না গেলেই বোঝা যায়, সারা দিনে একটা পরিবারে কত ধান্দায় কত লোক আসে। ধূপ নেবেন, বলে এক মহিলা এলেন। স্বামীর কারখানা সাত বছর বন্ধ। ধূপই এখন বাঁচার পথ। সে যেতে না যেতেই এসে গেল বিহারী ফলঅলা। পাওনাদার। মা ধারে আপেল আর সিঙ্গাপুরী কলা খেয়েছেন। সে যেতে না যেতেই এসে গেল, ঝাঁটার কাঠি নেবে মা ঝাঁটার কাটি। তাকে পত্রপাঠ বিদায় করতে না করতেই এসে হাজির হাওড়ার এক আশ্রমের প্রতিনিধি, 'মা আমাদের প্রতি মাসেই কিছু সাহায্য করেন।' তাঁর ব্যবস্থা করে চেয়ারে এসে বসতে না বসতেই আবার কড়া। এবার যেন ডাকাত পড়েছে। আমার গুরুজনেরা বললেন, 'কেন ব্যর্থ চেষ্টা করছ? তোমার বসার উপায় রাখেননি ভগবান! বহু রকমের অশান্তি তৈরি করে রেখেছে। তুমি বরং চেয়ারটা তুলে নিয়ে গিয়ে দেউড়িতেই বোসো। আমাদের একটু শান্তিতে বসতে দাও।'

ভীষণ বিরক্ত হয়ে দরজা খুলতেই দশাসই এক মহিলা। আমার

পরিচিতা। একটু বেশি উচ্ছল। ইনস্টলমেণ্টে শাড়ি বিক্রি করেন। মাঝে-মধ্যে আমিও একটু প্রশ্রয় দিয়ে ফেলেছি। আমাকে প্রায় ঠেলেই ভেতরে চলে এলেন। আজ আবার একটু বেশি সাজের ঘটা। ভদ্রমহিলার সব কিছুই একটু উঁচু, উঁচু। গলা উঁচু, চলার ধরনও উঁচু, শরীরও উঁচু। ঢুকেই বললেন, 'আব্বাবা, কাজ নেই কম্ম নেই, এক ঘর লোক বসে বসে ক্রিকেট দেখা হচ্ছে, আর গেল গেল চিৎকার।' কথা শেষ করেই হাঁক পাড়লেন, 'বউদি, কই গো কোথায় গেলে।'

বৃদ্ধরা সবাই চোখ ফেরালেন। বিরক্ত হয়ে বললেন, 'হু ইজ শি।' আর সেই মুহূর্তে কপিল ক্যাচ তুলে বীরের মতো প্যাভেলিয়ান মুখো হলেন। সবাই বলে উঠলেন, 'হোপলেস। হোপলেস। এই কি একটা ক্যাপ্টেনের খেলা। মাত্র ছরানে আউট!'

এক কপিল সমর্থক প্রতিবাদ করলেন, 'ক্যাপ্টেন হলেই কি সেঞ্চুরি করতে হবে! ক্যাপ্টেনদের মাথায় সব সময় কত দুর্ভাবনা চেপে থাকে জানেন আপনি? এই যে ছয় করেছে, এই আমাদের বাপের ভাগ্যি। লেন হটন কবার লেমডাক হয়েছেন জানেন? জানেন ব্রাডম্যান কবার হেঁচকি তুলেছিলেন? ক্রিকেট ইজ ক্রিকেট। কভী আঁধেরা, কভী উজালা।'

হঠাৎ একজন, পুরোহিত মশাইকে লক্ষ্য করে, ফিসফিস করে উঠলেন, 'মহা অপয়া। উনি থাকলে আমাদের হেরে মরতে হবে। মনে আছে, এ বছর তিনের পল্লীর পূজামণ্ডপে আগুন ধরে গিয়েছিল। আরে উনিই তো ছিলেন পূজারী।'

সঙ্গে সঙ্গে একজন উঠে গিয়ে বললেন, 'ঠাকুরমশাই, এবার তো আপনার পুজোয় বসার সময় হল!'

'পুজো? আজ আবার কিসের পুজো। আজ আমার বদলি ঠিক করে এসেছি। আমি সেই লাঞ্চের সময় বাড়ি গিয়ে ঝট করে লাঞ্চ সেরে আসব। আমি আসন করে বসেছি, ডোণ্ট ডিস্টার্ব। সেই থেকে ননস্টপ বগলাস্তোত্র আউড়ে চলেছি। তাই তো অতি কষ্টে

কপিলের কাছ থেকে ছয় আদায় করতে পেরেছি, নয় তো শূন্যতেই বাবাজীবনকে ফিরতে হত।'

'ঠাকুরমশাই লাঞ্চেব সময় তো পেবিয়ে গেছে। বলুন ডিনার।'

'ওই হল আমি এখন কুম্ভক করে কালকে স্তব্ধ করে বেখেছি।'

কালকে আব কতক্ষণ স্তব্ধ করে রাখবেন, ওভারের পর ওভার এগিয়েই চলল। ভাবত মাত্র একটা রানের জন্যে কুপোকাত হয়ে গেল। সবাই যেতে যেতে মন্তব্য করে গেলেন, টিভিটা অপয়া, এর আগের ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হোয়াইটে ভারত বিশ্বকাপ জিতেছিল। সাংবাদিক সংবাদপত্রের স্তম্ভে লিখলেন, হাউ নট টু উইন। পাকিস্তানের প্রশংসায় সবাই পঞ্চমুখ। শেষ ওভারের শেষ বলে ছয় মেরে ম্যাচ জেতার স্নায়ু তাঁদেরই আছে। অস্ট্রেলিয়া একটা টিম। তাঁরা তো 'আণ্ডারডগ'। আমাদেব হকি তো গেছেই। ক্রিকেটটাও গেল। একটা মেয়ে অলিম্পিকে দৌড়বে বলেছিল, পি. টি. উষা। তার আবার পায়ের শিব টেনে ধরেছে। ভারতীয় ক্রিকেটবীরেরা এখন বিজ্ঞাপনে দাড়ি কামাবেন, ফলের রস খাবেন, সুদৃশ্য জামা পরে চলমান সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠবেন।

কপিলদেবের ঠোঁটের কাছে মাইক্রোফোন ধবে প্রশ্ন করা হল, 'জেতার ম্যাচটা হাবলেন কি করে?—ডাঁট মেরে।' তা অবশ্য বলেননি, বললেন, 'দিস ইজ অল ইন এ ক্রিকেট। একেই বলে ক্রিকেট। এই তো জীবন। যে দিকে তাকাই। বেয়ারা হুইস্কি লে আও।'

বিনিকে জিজ্ঞেস করা হল, 'শূন্য রানে আউট হলেন মশাই। এক সময় কি সুন্দর খেলতেন।'

—'সো হোয়াট? প্রেমে, বাজনীতিতে আর ক্রিকেটে অসম্ভব বলে কিছু নেই। কপিলদা কি করলেন!'

পরের দিন অফিসে গিয়ে উদ্বিগ্ন মুখে একটা ছুটির দবখাস্ত ঠুকে দিলুম, স্ত্রী ভীষণ অসুস্থ। এখন-তখন অবস্থা। আরও চাবটি দরখাস্ত পড়ল। ছুটি নেবার ওই একই কারণ, স্ত্রী অসুস্থ। ছুটির দপ্তরের

বড়বাবু হাসতে হাসতে বললেন, 'বিশ্বকাপ কি রকম ভাইরাস দেখেছেন, ঘরে ঘরে স্ত্রীরা পটাপট অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। আপনার ডিপার্টমেণ্টের এক ভদ্রলোক আমার প্রতিবেশী। সকালে তাঁর স্ত্রী আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন টেলিফোন করতে। হাসলেন, বসলেন, চা খেলেন, তখন কি জানতুম ভদ্রমহিলা অসুখে মরোমরো।'

ওদিকে পাকিস্তানের বিজয়রথ গড়গড়িয়ে এগিয়ে চলল। শ্রীলঙ্কা কাত। ইংল্যাণ্ড ফ্ল্যাট। ভারতকে লাহোরে গিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে লড়তে হবে। কি হবে ভাই, বলে কলেজে মেয়েরা একে অন্যের ঘাড়ে গড়িয়ে পডলেন। শরীরের ওজন কমছে, কি ব্লাডপ্রেসাব কমছে বলে মানুষ যত না ভেবে পডল রানরেট কমছে বলে তার চেয়ে বেশি ভাবনা। বাজারে সাতসকালে দু'জনে দেখা। প্রশ্ন, 'এখন কত যাচ্ছে?' উত্তর, 'পঁয়তাল্লিশ টাকা।'

'ধ্যার মশাই তেলেব দাম কে জিজ্ঞেস করছে। তেলের রেট নয়, রানরেট কত যাচ্ছে।'

'পড়েছেন, আপনাদেব কপিল গাওস্কাবকে কি রকম ঝেড়েছে।'

'ঝেড়েছে না কী। বেশ করেছে। না ব্যাটে, না বলে?'

'আপনি গাওস্কারের কি বোঝেন?'

'আপনি কপিলের কি বোঝেন? এ আপনার গঙ্গাসাগরের কপিল নয়, হরিয়ানার টাইগাব।'

'বোম্বে ভার্সস পাঞ্জাব হচ্ছে।'

'সে খেলা আবার কবে?'

'কবে আবার কী, ভারতের ক্রিকেটের আসল খেলাটাই তো বোম্বে আর পাঞ্জাবে। দেখা যাক সিদ্ধার্থ রায় কি করেন?'

'শুনেছি ভাল ব্যাটসম্যান। পশ্চিমবাংলার যখন চিফ মিনিস্টার ছিলেন, চকলেট রঙের গেঞ্জি পরে প্রায় মাঠে নেমে পডতেন।'

'উনি তো এখন খালিস্তানীদের বিরুদ্ধে ব্যাট করছেন, সে তো দীর্ঘ ইনিংস?'

'কি থেকে কি হয় কেউ বলতে পারে।'

'বাট গাওস্কর ইজ গাওস্কব। গাওস্কর মানেই রেকর্ড। কপিলের কি রেকর্ড আছে মশাই।'

নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে গাওস্কর রেকর্ড করলেন। গোটা ম্যাচটাই রেকর্ড। পরপর তিনটে উইকেট নিয়ে বোলারের হ্যাটট্রিক। সারাটা জীবনের মতো তাঁর হয়ে গেল। ওই রেকর্ড ভাঙাও আর খাও। ছবি বাঁধাইয়ের দোকানে কাতারে কাতারে গাওস্কর। কার্ড বোর্ড দিয়ে বাঁধালে পঁচাত্তর, প্লেন পঞ্চাশ।

'লক্ষ্মীবাইগুারের' মালিক বললেন, 'তোমার বাবার ছবিটা বাঁধাই হয়ে আজ এক বছবেব ওপর পড়ে আছে; সেটার আগে ডেলিভারী নাও, তারপর না হয়…।'

'হেল উইথ ইওর ফাদার। এটাকে আগে চড়িয়ে দিন। ফাইনালের পর মালাটা আমি কোথায় চডাবো?'

আমার সহকর্মী, ক্রিকেটপাগল তানাজীর থেকে থেকে ভাব-সমাধি হতে লাগল। ঘোরলাগা মানুষের মতো একবাব এদিক যায়, একবার ওদিক যায়। সমবায়িকায় রেপসিড অয়েলের লাইনে দাঁড়িয়ে একবার সামনেব ভদ্রলোককে বলে, 'গাওস্কর কি করলে দেখেছেন।' একবার পেছনের সুন্দরী ভদ্রমহিলাকে বলে, 'এর নাম গাওস্কর। রেকর্ড। সারা জীবনটাই রেকর্ডের মালা। ওয়ান ডে ক্রিকেটে তিন হাজার রানের রেকর্ড।' চোখের দিকে তাকালে ভয় করে। ঠেলে যেন বেরিয়ে আসছে। কাজ করবে কি চেয়ারে চেপে বসানোই যাচ্ছে না। এরই মধ্যে হাজারখানেক টাকার ক্রিকেটের বই কিনেছে। মুড়ি কিনে এনেছিল। ঠোঙায় গাওস্করের ছবি দেখে, মুড়ি খাওয়া মাথায় উঠল। সব ফেলে ঠোঙা খুলে ইস্তিরি করতে বসে গেল। দুদিকে দুটো রেডিও ফিট করে রিলে শোনে। কোনও কমেন্টস যেন মিস না করে। তানাজীর পাশে বসেন সিনিয়ার জ্যোতিষদা। তিনি আবার রিলে শুনতে শুনতে কাগজে নোট করেন। রানের সংখ্যা, বলের সংখ্যা, অ্যাভারেজ, আস্কিং রেট। গণিতে পাকা। তাই

কোনও কাঁচা কাজ নেই। একদিকে গড়গড় করে প্রুফ দেখছেন, অন্যদিকে খেলার গতি অনুসরণ করছেন।

'সারা ভারত জেনে গেল, ভারত আবার ওয়ার্লডকাপ জিতছে। কারুর ক্ষমতা নেই ভারতকে ঠেকায়। ব্যাটে মার আছে। শুধু চার আর ছয়। শরীরে কুলোলে মাঝে মধ্যে খুচরো এক কি দুই। ভারতের ভল্লেবাজরা এবারের ওয়ার্লডকাপে আঠাশটা ছয় মেরেছেন। যেখানে ইংল্যাণ্ডের ব্যাটধারীরা মেরেছেন মাত্র আটটা। ভারতীয় বোলারদের হাতে বল ঘোরে। বল ছোটে। পৃথিবীর সেরা টিম। আর কি, কাপ আমাদের। পাকিস্তান বিদায় নিয়েছে।

টাকে চুল গজাবার মতো কলকাতার ব্রহ্মতালুর খানিকটা অংশকে খুবসুরত করার খেলা চলেছে। ফুটপাথে রঙ চড়ছে। এক জায়গায় খানিকটা অশ্বকৃত্য পড়েছিল সেটাও রঙ হয়ে গেল। আবর্জনা, তার ওপর দিয়েই বুরুশ চলে গেল। সরাবার কি সারাবার আর সময় নেই। এখানে ওখানে তোরণ খাড়া হল। আগেকার বাবুদের যেমন ধুতি আর পাঞ্জাবির সাদা রঙ মিলত না, অনেকটা সেইরকম। ধুতি লালচে জামা দুধসাদা। কলকাতার ভূষণ অনেকটা সেই ধরনেরই হয়ে রইল। তা থাক। প্রচারেই আমরা তিলোত্তমা করে দেবো।

'সুপার সপার' বলে একটা সাত লাখ টাকার যন্ত্র এসেছে। নিমেষে মাঠ শুকিয়ে দেবার ক্ষমতা রাখে এই অস্ট্রেলিয়ান যন্ত্র। সেই যন্ত্রে চেপে ক্রীড়া মন্ত্রী সারা মাঠে ফুরফুর করে হাওয়া খেতে খেতে ঘুরে বেড়ালেন। সাংবাদিকরা ছবি তুললেন। যন্ত্রের সাক্ষাৎকার নেওয়া হল। যন্ত্র অবশ্য কথা বলল না। বললেন প্রতিনিধি। পিচে দশ বালতি জল ঢেলে যন্ত্র চালানো হল। সঙ্গে সঙ্গে ইস্ত্রি। সবাই ধন্য ধন্য করলেন। অনেকেই চাইলেন বৃষ্টি আসুক। যন্ত্রের মহিমা দেখা যাক।

প্রার্থনা শুনলেন বরুণদেব। একটা নিম্নচাপ ঠেলে দিলেন। আকাশ কালো হয়ে এল। অক্রে হাজার দশেক বাড়ি ভেঙে পড়ল।

প্রাণ হারালেন কুড়িজন। কলকাতার ক্রিকেট ব্যারনরা পড়ে গেলেন মহা ঝাঁপরে। সাত লাখ টাকা উসুলের জন্যে বৃষ্টি চাই। বৃষ্টি এদিকে দরমা চ্যাটাই আর পিচবোর্ডের তোরণের চাক-চিক্য শেষ করে দিলে। বাস্তাব কাদায় পার্কস্ট্রীটে রঙের জেল্লা ছেতরে গেল। প্রবীণা মহিলাকে কি আব অঙ্গরাগে যৌবন ফিবিয়ে দেওয়া যায়।

দু লরি খাসা জঞ্জাল চলেছে আলিপুর রোডের দিকে। চালক মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস কবছেন, "ডালমিয়া সাহেবের বাড়ি কোনটা?"

"কোন্ ডালমিয়া?"

"ওই যে ক্রিকেটমিয়া।"

"তিনি তো গোয়েঙ্কা।"

"ওই হল। দু লরি মাল ডেলিভারি দিতে হবে।"

"জঞ্জাল ডেলিভাবি! কেন?"

"এটা আমাদের পৌর-আন্দোলন। হয় টিকিট দাও, না হয় জঞ্জাল নাও।"

টিকিট নিয়ে খাবলাখাবলি শুরু হয়ে গেল। কিছু টিকিট চলে গেল অন্তরালে, চোরাপথে পবে বেরবে বলে। ক্রিকেট তো শুধু খেলা নয়। বড ব্যবসা। বিগ বিজনেস। ধর্মেব সঙ্গে মিল আছে। ক্রিকেট ধর্ম। গুরুরা আসছেন ভায়া বোম্বে।

সেমিফাইনাল। ভারত বনাম ইংল্যাণ্ড। কত রানে যে হারবে ইংল্যাণ্ড। ভারত যে রকম টপ ফর্মে বয়েছে। মেরে আর ফেলে ফাটিয়ে দেবে। গাভস্কর তো কেবল ছয় মারবেন। ছয়ের মাঝে হাইফেনের মতো গোটাকতক চার। শর্টরান নেবার আর দরকার কি!

প্রতিবেশীর বাড়িতে মাইফেলের মতো ক্রিকেট দেখার আসর বসেছে। ওই বাড়িতে আর এক গাভস্করের কুঁড়ি ধরেছে। বয়সে তরুণ, কেতায় তরুণের বাবা। সে এখন ড্রেস প্র্যাকটিস করছে। পাড়ার মাঠে খেলতে যাবার আগে তার ড্রেসের কি ঘটা! যেন লেন হাটন নেট-প্র্যাকটিসে চলেছে। ধবধবে সাদা জামাপ্যাণ্ট। পায়ে

লেগগার্ড। ক্রিকেট হেলমেট নেই. বদলে স্কুটার হেলমেট। ব্যাটটা যে-কায়দায় দোলায়, সারা জীবন কত সেঞ্চুরি যে করবে! রাতে ছাদে আলো জ্বেলে, দুটো বাঁশের সঙ্গে বাঁধা আর একটা বাঁশে বল ঝুলিয়ে প্রায় মাঝ রাত পর্যন্ত শ্যাডো-প্র্যাকটিস করে। পয়সাঅলা ঘরের ছেলে। অনেক চামচা জুটেছে। দোতলার ঘরে টিভি। তার সামনে জনাচোদ্দ ছেলে। হো হো চিৎকার। কানপাতাই দায়। সে আজ দশ কেজি বুড়িমার চকোলেট বোমা কিনে আসর সাজিয়েছে। ইংল্যাণ্ডের এক একজন আউট হচ্ছেন আর দোতলা থেকে আশ-পাশের বাড়িতে বিকট শব্দে বোমা ঝাঁপিয়ে পড়ছে; সঙ্গে ডাকাতে চিৎকার। সেই চিৎকার মনে হয় বোম্বের মাঠের খেলোয়াড়রাও শুনতে পাচ্ছেন; কারণ মাঝেমাঝেই তাঁরা অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছেন।

ভারত মাঠে নামার সঙ্গে সঙ্গে পরপর গোটা ছয় সাত বোমা ফাটল। ওদের নিজেদের বাড়িরই জানলার কাঁচ ভেঙে পড়ে গেল। গাওস্কর পোজিশান নিলেন। অপর প্রান্তে বোলার বোলিং রান শুরু করেছেন। বুক টিপটিপ করছে। অনেকেরই ঠোঁট বিড়বিড করছে। মনে হয় বলছেন, জয় বাবা গাওস্কর। তোমাকে বিশ্বাস নেই বাবা। নেগেটিভ, পজেটিভ দুটো রেকর্ডই তোমাব হাতের মুঠোয়। চোখ বুজিয়ে ছিলুম। ঘরের সবাই চিৎকার করে উঠলেন, 'পেরেছে। পেরেছে।'

বৃন্দাবনবাবুকে ডাক্তার বলেছেন, একদিনের ক্রিকেটের শেষটা আপনি দেখবেন না। আপনার হার্ট নেবে না। আমারও সেই একই অবস্থা। অধিকাংশ সময় চোখ বুজিয়েই থাকি। হইহই শুনলেই চোখ খুলি। বুঝতে পারি ব্যাটে বলে হয়েছে। গাওস্করের পরের মারটা দেখার জন্যে সাহস করে চোখ খুলেই রেখেছিলুম। সেই মার যাকে বিদেশী সাংবাদিকরা বলেন 'ফ্যাণ্টাসটিক'। 'স্পেকটাকুলার'। গাওস্কর ব্যাট তুললেন। বল পায়ের ফাঁক দিয়ে গলে স্টাম্প ছেতরে দিলে। কমেণ্টেটার চিৎকার করে উঠলেন, আউট, হি ইজ ডেফিনিটলি বোল্ড আউট। বৃন্দাবনবাবুর কলেজে-পড়া মেয়ে, 'ও

গাভাস্কর' বলে গোল গার্ডেন চেয়ার থেকে উল্টে মেঝেতে পড়ে গেল।

কে একজন বললেন, 'যাঃ, বাপের বদলে মেয়ের স্ট্রোক হয়ে গেল। সানস্ট্রোক হার্ট স্ট্রোক নয় ক্রিকেট স্ট্রোক।'

তাকে ধরাধরি করে তুলে বিছানায় শোয়ানো হল।

বৃন্দাবনবাবু বললেন, 'বাপের রক্তেও ক্রিকেট, মেয়ের রক্তেও ক্রিকেট।'

বাঙালীর রক্তে যে কি নেই। স্লো-মোশান শুরু হয়েছে। আমাদের স্লো-মোশান যেমন হয়। ব্যাটসম্যান ব্যাট তুললেন। ধীরে বাঁদিকে ঘুরলেন। ক্যামেরা খেলোয়াড়ের পাছায় ফোকাস করে সেইখানেই আটকে রইল। বলের কি হল। কোথায় গেল! কে লুফল, দেখাবার উপায় নেই। গাভস্কর গ্লাভস খুলতে খুলতে প্যাভেলিয়ানে ফিরে আসছেন।

নিতুর হাহাকার, 'এ কি করলে গুরু। তোমার খেলা দেখব বলে, ছুটি পাওনা নেই, তাও ছুটি নিলুম। ছিছি, গুরু, এ কি করলে!'

'কপিলকে লাস্ট মোমেন্টে ল্যাং মেরে বেরিয়ে গেল। ছোট বড় অনেক কথা তুমি বলেছিলে ক্যাপ্টেন। এইবার ম্যাও সামলাও।'

'কিচ্ছু ভাবনার নেই। ভারতের ক্রিকেট, খেলা-নির্ভর নয় মশাই, ভাগ্য-নির্ভর। দেখবেন লাস্ট মোমেন্টে একজন সেভিয়ার হয়ে দাঁড়াবে। তা ছাড়া আমাদের কপিলভাই আছে। এসেই বেধড়ক পেটাবে বাঘের বাচ্চার মতো। রানের ভলক্যানো ছুটবে।'

কপিল ভাই এলেন। মহিলারা আদর করে বললেন, 'ওই যে কপলে এসেছে। কপলে। দেখি বাছা শখানেক তুলে দিয়ে যাও তো। এবারে তোমার ব্যাটও গেছে বলও গেছে।'

কপিল ক্রিজে এসে দাঁড়ালেন। হাঁ করে ফ্যালফ্যালে, ভ্যাল-ভ্যালে মুখে, এদিক ওদিক তাকাতে লাগলেন।

'কি খুঁজছেন বলুন তো?'

'স্ট্যাডিয়াম দেখছেন। দেখছেন কজন ফিল্মস্টার এসেছেন!'

'না না, বউকে খুঁজছেন। তাঁর ইশারাতেই তো ছয় আর চার

হবে। ইনস্পিরেশান।'

প্রথম বলটা কপিল মেরেছেন। সবাই গানের সুরে গেয়ে উঠলেন, 'মেরেছে। মেরেছে। পেরেছে। পেরেছে।' গাওস্কর চলে যাবার পর, দর্শকরা এত হতাশ হয়েছেন, ধরেই নিয়েছেন এঁরা আসবেন আর যাবেন। কপিল আবার সেই ফ্যালফ্যালে মুখে এদিকে ওদিকে তাকাচ্ছেন। প্যান্টের কোমরে আঙুল ঢুকিয়ে টানাটানি করছেন।

'কি হয়েছে বলুন তো?'

'অস্বস্তি হচ্ছে! মনে হয় নিম্নবেগ।'

'ছারপোকাও হতে পারে।'

"না না। ভীষণ 'মুডি প্লেয়ার'। আজ আর খেলায় তেমন মুড নেই।"

'মুড নেই! মামার বাড়ি। ভারতকে জেতাতেই হবে। কলকাতা সেজে বসে আছে, আসতেই হবে। পেটাও ভাই পেটাও। একটু হাত খোলো। ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।'

কপিল হাত খুললেন। মার ছক্কা। বল আকাশে। বাউণ্ডারি লাইনের কাছে নামছে। এক জোড়া হাত ধরবার জন্যে প্রস্তুত। সবাই মনে মনে বলছেন, মিস্, মিস্টার মিসেস। বিলিতি থাবা। কমেন্টে-টার চিৎকার করে উঠলেন, 'আউট। কপিল আউট।'

কপিল ফ্যালফ্যালে মুখে এদিকে ওদিকে তাকাচ্ছেন। আমার সাধ না মিটিল, আশা না পুরিল। বৃন্দাবনবাবু হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করেন। তিনি উত্তেজনায় চিৎকার করে উঠলেন, 'ইনজাংশান, ইনজাংশান।'

'ইনজাংশান মানে!'

'এখনও বোম্বে হাইকোর্ট খোলা আছে। সোজা গাড়ি নিয়ে চলে যাও। তিনশো তেত্রিশ ধারায় একটা স্টে-অর্ডার নিয়ে এসে খেলা বন্ধ করে দাও। আবার গোড়া থেকে শুরু করো। স্টেডিয়ামে অত-গুলো লোক বসে বসে হায় হায় করছে। এই সামান্য বুদ্ধিটুকু মাথায় আসছে না। দেশে আইন-আদালত রয়েছে কিসের জন্যে! দুর্বলের

ওপর সবলের অত্যাচার! সংবিধান বিরোধী!'

'বেআইনি তো কিছু করেনি ইংল্যাণ্ড।'

'করেছেন আম্পায়ার। এল. বি. ডব্লু মানের জোচ্চুরি। কপিলের ক্যাচটা বাউণ্ডারির বাইরে হয়েছে। আই অ্যাম সিওর অফ ইট। আজ আমি বোম্বেতে থাকলে খেলা বন্ধ করিয়ে দিতুম। একটা গাড়ি ওই ওয়ানখাড়ে স্টেডিয়াম থেকে বেরিয়ে আসত। সোজা হাইকোর্ট। ম্যাচের বারোটা।'

ভেবে আর লাভ নেই। এদিকে একে একে নিবিছে দেউটি। ভারতীয় খেলোয়ারদের অন্য কোথাও বড় ধরনের কোন অ্যাপয়েন্ট-মেণ্ট আছে মনে হয়। সব এলোমেলো। একে একে আসছেন আর উইকেট ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছেন। কে কত কম রানে আউট হতে পারে তারই যেন কম্পিটিশান চলেছে।

একজন করুণ সুরে বললেন, 'আর কি কোনও আশা নেই ভাই?'

'আর ব্যাটসম্যান কোথায়! সবাই তো বোলার!'

'কেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে পাকিস্তান তো পেরেছিল!'

'সে ভাই পাকিস্তান! তাদের কলজের জোর আছে।'

বৃন্দাবনবাবু বললেন, 'টিভি বন্ধ করে দাও। এর আর কোন আশা নেই। হকি গেল। ফুটবল গেল। ক্রিকেটটাও গেল। ফিনি-শড্। এ টিম আর কোনও দিন উঠতে পারবে না।'

শেষ ওভারের শেষ বল। রিলায়েনস কাপ থেকে ভারতের বিদায়। কপিলস ডেভিল হয়ে গেল কপিলস ইভিল। সারা পাড়ায় নেমে এল নিস্তব্ধতা। সেই স্তব্ধতা ভঙ্গ করে দুম করে একটা বোমা ফাটল কোথায়!

'কে বোম ফাটায়! চল, চল। দেশের শত্রু। মেরে ক্যালেণ্ডার করে দিয়ে আসি।'

প্রবীরবাবুর ছেলে বোম ফাটিয়েছে। 'বেরিয়ে আয় শালা।'

ছেলেটি বেরিয়ে এসে বললে, 'এ বোম সে বোম নয়।'

'তার মানে?'

'এ হল কালীপুজোর বোম।'

'কালীপুজোর বোম। মার শালাকে। মেরে চিত্রকূট করে দে।'

'ব্যাটাকে বোম মেরে শুয়োর করে দে। ইংল্যাণ্ডের সাপোটার।'

ছেলেটা হাসপাতাল চলে গেল। মোড়ে মোড়ে জটলা। এক এক জটলায় এক এক আলোচনা।

'ওই বোম্বের টিভি কোম্পানিই এর মূলে। চার মারলে পাঁচশো, ছয় মারলে হাজার।'

'আর ওই নিউজিল্যাণ্ডের সঙ্গে খেলায় গাওস্করের সেঞ্চুরি। কত পেয়েছেন জানিস, ২৫ হাজার।'

'আর লোগো কেলেঙ্কাবিব কথটা বলো। ওটা চেপে গেলে চলবে কেন? লোগোর লড়াইয়ে তো দশজন খেলোয়াড চুক্তি সই করতে চাইছিলেন না।'

'আর বিজ্ঞাপনের কথাটাও বলো। গাওস্করকে তুমি সাতনা কোম্পানির বিজ্ঞাপনে দেখতে পাবে। কপিলদেবকে ছটায়। রোজ-গার জানো, প্রত্যেকে দশ লাখ টাকা কামিয়েছেন।'

'ক্রিকেট আর খেলতে হবে না। বিজ্ঞাপনেই ক্রিকেট খেলতে বলো।'

একটি মেয়ে তার প্রেমিক বলছে, 'আমাব আর বাঁচতে ইচ্ছে করছে না বিশু। মনে হচ্ছে জলে ডুবে আত্মহত্যা করি।'

'কোরো না মাইরি। একে আমি ভারতের শোকে মরছি। তুমি মরে গেলে ডবল শোক সহ্য করতে পারবো না। ক্রিকেট গেছে যাক, আমি তো আছি মানু। সরে এস, এই দুঃখের দিনে তোমার ঠোঁটে ঠোঁট ঠেকাই।'

'ওসব বাহানা ছাড়। কারুর সর্বনাশ। কারুর পৌষমাস।'

'বাচ্চা কাঁদলে ললিপপ পায়।'

'আমার ঠোঁটটাকে তোমার ললিপপ হতে দোব না গুরু।'

ডবলডেকার বাসের পেছনে হাতে লেখা বড বড পোস্টার পড়ে গেল। ক্রিকণ্ট্রোল বোর্ড ভেঙ্গে দাও, গুঁড়িয়ে দাও। কপিল তুমি

সরে যাও। তোমাকে চাইছি না, চাইবো না। আমার পাশের প্রতিবেশী ভারত ফাইন্যালে যাবেই জেনে, দু বোতল হুইস্কি মজুত করেছিলেন, আব বউকে দিয়ে দু কেজি মাংস রঁধিয়েছিলেন। মাংস গেল রাস্তায়। হুইস্কি চলে গেল পেটে। সারা রাত ভদ্রলোকের আর্তনাদ, 'হায় হায়। ওই অপয়াটার জন্যে আমার সোনার বাংলা শ্মশান হয়ে গেল রে।' ডুকরে ডুকরে কান্না।

'কে অপয়া!'

'আমি গো, আমি। টিভির সামনে থেকে উঠে গেলেই ছয়। এসে বসলেই আউট। বন্ধুগণ! ও বন্ধুগণ আমাকে জুতিয়ে লাস করে দাও।'

শেষে গান ধরলেন, 'কি যে কবি! উরে বাবারে! কি যে করি। উরে বাবারে!'

সারা রাত মাংস নিয়ে গোটাচারেক কুকুরের চুলোচুলি। বাপের জন্মে ওরকম মাংস খায়নি।

কাতারে কাতারে লোক ছুটছে ইডেনের দিকে। ক্লাবহাউসের সামনে পা ফেলার জায়গা নেই। কাল ফাইন্যাল? এক প্রবীণ বলছেন, 'জিনিসটা করেছে ভাল। তবে কি জানেন, একেই বলে নেপোয় মারে দই। কার আশায় আসব সাজানো হল; আর আসছে কারা? বেত দিয়ে গেট কবেছে দেখেছেন! একে বলে শিল্প।'

গাড়ি করে একজন ফিল্মস্টার চলেছেন। সমঝদারের চোখ। সবাই শোক ভুলে হইহই করে উঠলেন। পুলিসের ঘোড়া ছুটে এল। লম্বা চওড়া বিখ্যাত এক লেখক ঢোলা পাজামা আর গেরুয়া পাঞ্জাবি পরে এগিয়ে আসছেন। আলোকিত ইডেন দেখতে এসেছেন। ক্যানরা ঠিক ধবে ফেলেছে। বাসের টিকিটের পেছনে অটোগ্রাফ দেবার অনুরোধ। ফাইবার গ্লাসের স্বচ্ছ চাঁদোয়া দেখে এক মহিলার কি উল্লাস? টি ভি সম্প্রসারণের ঘেরাটোপের বাইরে থেকে কৌতূহলী মানুষের উঁকিঝুঁকি। এরই মাঝে বিনয় হারিয়ে গেছেন। সাথীদের চিৎকার। একজন বললেন, চোপ! একদম চেঁচাবেন না। গর্ভানার রেগে যাবেন।"

সূর্য পশ্চিমে তলিয়ে গেল। সুনীল আকাশ। আবহাওয়া ফিরল, ভারতের ভাগ্য ফিরল না। টিকিটের ভাগা দিয়ে সবুজ মাঠে সার সার বসে গেছেন লোভীরা। বাণিজ্য করার আশায় টিকিট ধরেছিলেন সব। এখন ভরাডুবি। ভারত নেই। টিকিটের চাহিদাও নেই। পাবলিক এক একজনের কাছে যাচ্ছেন আর উঁকি মেবে বলছেন, 'দেখি এই দোকানে কি পাওয়া যাচ্ছে।' বিক্রেতা ক্লান্ত শুকনো মুখে তাকাচ্ছেন। সামনে ইট চাপা দশখানা চারশো টাকা দামের টিকিট। চারশো একশোয় নেমেছে, তবু ক্রেতা নেই। নির্জন জায়গায় একটি ছেলে দাঁড়িয়ে। চোখে পুরু লেনসের চশমা। হাতে ধরে আছেন একটি মাত্র টিকিট। সকাল থেকে খাড়া। ঠোঁট শুকিয়ে গেছে। চুলে ধুলো। পাশে যেতেই বললেন, 'নেবেন দাদা?'

'কত দাম?'

'চারশো।'

'কমে?'

ছেলেটি কেঁদে ফেলল। ছাত্র। থাকে খড়্গপুরে। নতুন সাইকেল বেচে ভারতের বিশ্বজয় দেখবে বলে টিকিট কিনেছিল। খেলা আর দেখতে চায় না। প্রয়োজনীয় সাইকেলটা ফিরে পেতে চায়। পকেটে একটা লজেনস্ ছিল এগিয়ে দিলুম, 'নাও মুখে ফেলে দাও। এক সময় আমি ক্রিকেটফ্যান ছিলুম। বৃহস্পতিবার থেকে ড্যাংগুলি-ফ্যান।'

পাশ দিয়ে একটি দল যেতে যেতে বললে, 'ঠিক হয়েছে। সব ব্যাটাকে পথে বসিয়ে দিয়েছে।'

বিকাশের বিয়ে

বিকাশ আমার বন্ধু। বিকাশ বিয়ে করবে। না করে উপায় নেই। ব্যাঙ্কে ভাল চাকরি পেয়েছে। পরিবাবের একটি মাত্র ছেলে। নিজে-দের বাড়ি আছে। বাবা মারা গেছেন। মায়ের বয়স হয়েছে। বিকা-শের বিয়ে অবশ্যম্ভাবী। আত্মরক্ষার জন্যেও বিয়ের প্রয়োজন। এ-দেশে অবিবাহিতা মেয়ের অভাব নেই। সকলেই যে প্রেম করবেন তা-ই বা আশা করা যায় কি করে! মেয়ের বাপ-মাকেই ভাল পাত্র ধরার জন্যে উদ্যোগী হতে হয়। বিকাশের হয়েছে মহা বিপদ। বিকাশ যেন তাজা ফুলকপি। বিকাশ যেন গঙ্গা থেকে সদ্য তোলা একটি ইলিশ মাছ। যাঁরা তাঁকে চেনেন, জানেন সকলেই তাকে ওই দৃষ্টিতে দেখেন। ঝোলাতে হবে। মেয়ের হাতের ইলিশ করে।

দু'চার কথার পরেই তাঁদের প্রশ্ন ইলিশের তেলের খোঁজে চলে যায়। কড়ায় ছাড়লে বিকাশ কতটা তেল ছাড়বে! ব্যাঙ্কের চাকরি? বাঃ বাঃ। কোন ব্যাঙ্ক? ন্যাশন্যালাইজড? এখন পাচ্ছ কতো? পাকা চাকরি? বেড়ে বেড়ে কোথায় উঠবে? প্রোমোশান আছে? বাঃ বাঃ তা ছুটিছাটার দিন এসো না একদিন। একটু ফ্রায়েড রাইস, চিকেন। রবীন্দ্র-সংগীত নিশ্চয় ভালবাসো। উমা আজকাল ভীষণ ভাল গাইছে। পল্লব সেনের প্রিয় ছাত্রী। তুমি ছবি ভালবাস না,ছবি? মেয়েটার আঁকার হাত দুর্দান্ত। নিজের মেয়ের প্রশংসা করা উচিত নয়। তবু না বলে পারছি না।

বিবাহযোগ্যা বাঙালি মেয়ের মা বাবার. বিশেষ করে মায়েদের যে কি উৎকণ্ঠা আর উদ্বেগের দিন কাটাতে হয় তা আমি জানি; কারণ আমার একটি বোন আছে। আমার মায়ের ঘুম চলে গেছে। এই বুঝি মেয়ে প্রেম করে বসল! এই বুঝি কোনও পাড়াতুতো মাস্তান মেয়ের হাত ধরে হেঁচকা টান মারল। আমার মায়ের যত রকমের

উদ্ভট চিন্তা। আমার বাবার জীবন অতিষ্ঠ। বাবা অফিস থেকে ফেরা মাত্রই প্রথম প্রশ্ন, 'কি খোঁজ নিয়েছিলে?'

সারাদিন অজস্র কাজের চাপে বাবার কিছু মনেই নেই, ফলে মিথ্যে বলে কি অভিনয় করে পরিস্থিতি সামাল দিতে পারেন না। পাল্টা প্রশ্ন, 'কি খোঁজ বলো তো?'

ব্যাস লেগে গেল ধুমধাড়াক্কা। 'ওই মেয়ে যখন তোমার মুখে চুনকালি মাখাবে তখন বুঝবে। সেইদিন তুমি বুঝবে। সেইদিন তোমার শিক্ষা হবে। কেউ বলবে না তখন আমার মেয়ে। সবাই তোমার নাম করে বলবে, ওমুকের মেয়ে।'

বাবার আর জামাকাপড় ছাড়া হল না, বিশ্রাম হল না, চা খাওয়া হল না। রেগে বেরিয়ে গেলেন। যেতে যেতে বললেন, 'আজ আমি যাকে পাবো তাকেই ধরে আনবো।'

খামোখা মাইল তিনেক অকারণ হেঁটে ধুঁকতে ধুঁকতে ফিরে এলেন রাত দশটায়। এই ভ্রমণের নাম প্রাতঃভ্রমণ নয়, পাত্র ভ্রমণ। এ তো হল গিয়ে রাগের পাত্র-ভ্রমণ। ঠাণ্ডা মাথায় পাত্র-ভ্রমণ অহর-হই চলছে। ভাল চাকুরে, অবিবাহিত ছেলেরা ঠিক ধরতে পারে। ভদ্রলোক বা ভদ্রমহিলা মাছ ধরতে বেরিয়েছেন। বগলে অদৃশ্য ছিপ। ছিপের সুতোয় ঝুলছে টোপ গাঁথা বঁড়শি। মেয়ের গুণের টোপ, বংশ-পরিচয়ের টোপ, ভাল মন্দ দেয়াটেয়ার টোপ। অনেকে আবার একটু বেশি দুঃসাহসী। চোখ দিয়ে দেহ জরিপ করেন, বুকের ছাতি, গলার মাপ। কেউ কেউ আবার কায়দা করে হাতের গুলি মেপে নেন। 'এই তো চাই, ফাইন ইয়াং ম্যান। এই তো চাই। সাহস, কারেজ, হেলথ।' ওপর বাহুটা কথা বলতে বলতে ধরে, তাগার মতো মেপে নিলেন। দেখে নিলেন,কতটা তাগড়া। বিয়ের ধাক্কা, সংসারের ধাক্কা সামলাতে পারবে কি না। ক্ষইতে কতটা সময় নেবে বাবাজীবন। পরে হয়তো একটু উপদেশ যোগ করলেন—'ব্যায়ামট্যায়াম করো, একটু ভালমন্দ সময়মতো খাও, শরীরম আদ্যম। শরীরটাই সব।'

বাজারের মাছ আর ব্যাগের মাছের যা পার্থক্য। কোনক্রমে

একটা ব্যাগে ঢুকে গেলে, আর দরদস্তুর নেই। কানকো তুলে তুলে দেখা নেই। বিকাশ সেই কারণেই ব্যাগে ঢুকে পড়তে চায়। ছেলে ভাল। তেমন লোভী নয়। শ্বশুর মেয়ে হাণ্ডা চাপতে চায় না। সে-রকম বন্ধুও আমার আছে। সোমেন। সে তো প্রায় দফতর খুলে বসেছিল, রাজনৈতিক নেতাদের মতো। পার্টি অফিস। ঠিক সে খোলেনি। খুলেছিলন তাঁর পিতা। ছেলের পেছনে ভদ্রলোকের যথেষ্ট ইনভেস্টমেন্ট ছিল। অভাব সত্ত্বেও ছেলেকে সাংঘাতিকভাবে মানুষ করেছিলেন। ছেলেও সরেস ছিল। শেষে আই. এ এস. হয়ে পাড়াপ্রতিবেশীকে তাক লাগিয়ে দিলে। এম এ-তে ফার্স্ট ক্লাস পাবার পরই আমাদেব সঙ্গে ব্যবধান বাড়তে লাগল। আই. এ. এস হবার পর আমাদেব কোনও রকমে একটু চিনতে পারত। ভাল পোস্টিং হয়ে যাবার পর পথেঘাটে দেখাহলে,চোখে চোখে তাকিযেই চোখ ফিরিযে নিত। টর্চলাইট ফেলার মতো। সোমেনেব বাবা বলতেন, ছেলে হল হীরে। কত খুঁজে তোলা হল। তাবপর অভিজ্ঞ হাতে কাটাই ছাঁটাই। কত খরচ। তারপর নিলাম। এক লাখ বিশ! দেড় লাখ। তিন লাখ! কে হাঁকবে দর। মেয়ের বাবারা।

সোমেন নামক হীরক খণ্ডটি প্রায় তিন লাখে বিকিয়ে গেল। জাহাজ থেকে মাল খালাসের বিজনেস ছিল শ্বশুরমশাইয়ের। বেহালায় বিশাল বাগানবাড়ি। সেই বাগানে আবার ফোয়ারা। মার্বেল পাথবের উলঙ্গ নারীমূর্তি। সোমেনের বাবার সঙ্গে আগেই আলাপ ছিল। বড়লোকের কন্যাটি অসুন্দরী ছিল না; তবে যাদের ঘরে ছ'ছটা গরু থাকে তাদের ছেলেমেযেবা একটু গায়েগতরে হবেই। আর বড়লোকেরা একটু মোটাসোটা না হলে মানায় না। মেদ হল অর্থেব বিজ্ঞাপন। থেঁকুবে বড়লোক হলেও কেউ বিশ্বাস করবে না। কাগজে বিজ্ঞাপন লাগাতে হবে। বড়লোকের নানা শরীর-লক্ষণ থাকা উচিত। কর্তার পঞ্চাশের পর রক্তে চিনি। চায়ের কাপে আয়েস করে স্যাকারিনের পুঁচকি-ট্যাবলেট ফেলতে ফেলতে বলবেন, একটু বেড়েছে, একশো আশি। অর্থাৎ ওদিকে ব্যাঙ্কে যত বাড়ছে,

সেই অনুপাতে এদিকেও বাড়বে। মানি হল হানি। টাকা হল সুগার কিউব। রক্ত তো বটেই। তা না হলে রক্তের চাপ বাড়ে কেন? চল্লিশের পরেই গৃহিণীব বাত। বাতের জন্যেই রাজহংসীব মতো চলন। মেয়েটি সুন্দরী; কিন্তু মোটা। সোমেনের বাবা কোনও রকমে একতলা একটা বাড়ি করেছিলেন। প্ল্যাস্টার আর রঙ ছিল না। বেয়াইমশাই মেয়েকে পাঠাবার আগে একদল কণ্ট্রাক্টার পাঠালেন। তাঁরা এক মাসে আড়াই তলার একটা ছবি খাড়া করে দিলে। কটক থেকে মালি এসে চারপাশের খোলা জায়গায় ফুল ফুটিয়ে দিলে। দু তিন লরি ফার্নিচাব ঢুকে পড়ল হুই হুই করে। তারপর বাজল সানাই। সে কি সুর কালোয়াতি! পাড়াপ্রতিবেশীর বুকেব চাপা কান্না যেন বাতাসে কাঁপছে। প্রতিবেশীরা কাঁদবেই তো। সোমেনের বাবা ছিলেন সামান্য মানুষ। অবস্থা তেমন ভাল ছিল না। জীবনেব প্রথম দিকটায় খুচখাচ ব্যবসা করতেন। শেষটায় কবতেন ঘটকালি। সেই মানুষ কিভাবে একটা একতলা বাড়ি করলেন। আধাখেঁচড়া হলেও মাথার ওপর ছাদ তো! সেইটাইতো প্রতিবেশীর কাছে বিশাল এক প্রশ্ন। সেই প্রশ্নের উত্তব খুঁজতে গিয়েই তো, নিজেদের প্রশ্ন, আমরা কেন পারলুম না। সেই মনে হল, আমরা কেন পারলুম না, অমনি ভেতরে শুরু হল শৃগালের কান্না। যাক সোমেনদের বাড়ি হওয়ার ক্ষত শুকোতে না শুকোতে, সোমেনের এম. এ.তে ফার্স্টক্লাস ফার্স্ট হওয়া। সে যেন পুবনো ক্ষতে নুনের ছিটে। একটা ছেলে চোখের সামনে তরতর করে সৌভাগ্য আর প্রতিপত্তির দিকে এগিয়ে যাবে, এ তো সহজে সহ্য করা যায় না। এব পরের মস্ত আঘাত হল সোমেনের আই. এ এস. হওয়া। যাঃ সর্বনাশ। এ ছেলেকে তো শুধু মাত্র ঈশ্বরের কাছে আন্তরিক প্রার্থনায় সাধারণের স্তরে আটকে রাখা গেল না। এ তো অফিসার হবেই। গাড়ি, কোয়ার্টার, মোটা মাইনে, প্রতিপত্তি, ক্ষমতা, সবই তার হাতের মুঠোয়। চিন্তায় চিন্তায় একপাড়া লোক রোগা হয়ে গেল। আমরা তখন সোমেনকে বয়কট কবলুম। যে ছেলে অসামাজিক হয়ে যাবে, তার সঙ্গে খাতির রেখে

আর লাভ কি? শেষ আঘাত সোমেনের বিয়ে। আমরা নিমন্ত্রিত হওয়া সত্ত্বেও, না গেলুম বরযাত্রী, না গেলুম বউভাতে। যে ছেলে বিয়েতে শ্বশুরকে দোহন করে পণ নেয়, উপহার নেয়, সে একটা নির্লজ্জ লোভী। তার অনুষ্ঠানে যাওয়াটাও পাপ। বড়লোকের আবার না চাইতেই কিছু তাঁবেদাব জুটে যায়। সোমেনের পক্ষে অনেকে বলতে লাগলেন, 'শ্বশুরের আছে তাই দিয়েছে, সে তো আর চায়নি।' চেয়েছে কি চায়নি বুঝল কি করে।

বিকাশ বললে, 'সোমেনের মতো আমি চামার নই। একটা পয়সাও আমি নেবো না। তবে হ্যাঁ,আমার একটা সর্ত আছে, মেয়েটি সুন্দরী হওয়া চাই। বউ নিয়ে বুক ফুলিয়ে যেন রাস্তায় হাঁটতে পারি। বিকাশের মা বললেন, 'হ্যাঁ বাবা, ছেলেকে আমি নিলেমে চড়াব না। তবে মেয়ে পক্ষ যদি মেয়েকে ঘব সাজিয়ে দিতে চান, তা-হলে আমি রোজগেরে ছেলের অহঙ্কারে অপমান করতে পারবো না। লক্ষ্মী বড় চঞ্চলা। অহঙ্কার একেবারে সহ্য করতে পারেন না।'

শনিবার রবিবার বিকাশের কাজই হল আমাকে নিয়ে মেয়ে দেখতে বেরনো। একটা ব্যাপার লক্ষ্য করছি ছেলেরা যখন বেকার থাকে তখন সে প্রেমিক। প্রেম করে বেড়ায়। যেই সে ভাল চাকরি পেল, অমনি তার প্রেম ঘুচে গেল, তখন তার আটকাঠ বেঁধে, ঠিকুজি কোষ্ঠী মিলিয়ে বউ আনার তাল। বিকাশের একজন প্রেমিকা ছিল, তাকে আর পাত্তাই দেয় না। আমি জিজ্ঞেস করেছিলুম, ব্যাপারটা কি। প্রথমে বলতেই চায় না, শেষে বললে, 'আমি একটু ভাল মেয়ে চাই। আর এখন আমার চাইবার অধিকারও এসেছে। 'প্রেমের আবেগে বোকামি করলে আমাকেই পস্তাতে হবে। সারা জীবনের ব্যাপার। সারা জীবন প্রেমের চশমা পরে একটা মেয়ের দিকে তাকানো সম্ভব নয়। বাস্তব হল অঙ্কের মতো।'

'তোর প্রেমিকাটি তো ভালই দেখতে।'

'ভাল দেখতে হলে কি হবে, ভীষণ ঘামে আর সর্দির ধাত।'

আমি হাঁ করে বিকাশের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলুম।

পৃথিবীতে কত রকমের মাল ভগবান!

জিজ্ঞেস করলুম, 'একটা মেয়েকে বাইরের দেখায় তুই রূপটা দেখলি, অন্তরঙ্গ খবর পাবি কি করে! ঘামে কি না, সর্দি হয় কি না। তোকে তাহলে অবজেকটিভ টেস্টের মতো প্রশ্ন-পত্র বিলি করতে হবে রে? তুই কি চাস বল তো।'

'অনেক মেয়ে আছে খাওয়াদাওয়ার পর ঢেউ করে গ্যাসের রুগীর মতো ঢেঁকুর তোলে।'

'তারপর?'

'সেফটিপিন দিয়ে দাঁত খোঁটে। হাত ধুয়ে আঁচলে হাত মোছে। চিৎকার করে কথা বলে। দুমদুম করে সিঁড়ি ভাঙে। কথা বলার সময় গায়ে ধাক্কা মারে। দু'দণ্ড স্থির হয়ে বসতে পারে না, পা নাচায়। খাওয়ার সময় চ্যাকোর চ্যাকোর শব্দ করে। ঠুকে জিনিস রাখে। চিরুনিতে চুল ওঠে। মাথায় খুসকি হয়। পেটে হুড়হুড় গুড়-গুড় শব্দ হয়। জ্বর হলে উঁ আঁ করে। ধনুকের মতো বেঁকে শোয়। হাঁউ হাঁউ করে হাই তোলে। নির্জনে নাক খোঁটে। খেতে বসে আঙুল চোষে। দাঁত দিয়ে নখ কাটে।'

'অসম্ভব। তোর বিয়ে হওয়া অসম্ভব। হলেও ডিভোর্স হয়ে যাবে। এই সব ডিফেক্ট একটা মেয়ের খুব কাছে না এলে ধরা যায় না।'

'ধরার চেষ্টা করতে হবে। বউ করব বাজিয়ে। এ তো প্রেম করা নয়, যে মেনে নিতে হবে প্রেমের প্রলেপ দিয়ে।' আমি সব শুনে রাখলুম। মনে মনে হাসলুম। এমন মেয়ে মানুষের বাড়িতে মেলা অসম্ভব। কোমরটুলিতে অর্ডার দিতে হবে। স্বয়ং মা দুর্গাও হয়তো অসুর মারার সময় ঘেমেছিলেন।

রবিবারের এক বিকেলে আমরা বামবাজারতলায় মেয়ে দেখতে গেলুম। বেশ বড় সাবেক আমলের বাড়ি। গ্যারেজ আছে। বিকাশ ঢুকতে ঢুকতে বললে, 'আমার ষষ্ঠ অনুভূতি বলছে, এই বাড়িই আমার শ্বশুরবাড়ি।'

'হলেই ভাল, তবে তোমার যা চাহিদা।'

বৈঠকখানায় আমরা বসলুম। বসতে না বসতেই মেয়েব বাবা সবিনয়ে এসে হাজির। মোটাসোটা এক ভদ্রলোক। ঢোলা পাঞ্জাবি পবিধানে। ভুঁড়িটা সামনে ফুটবলেব মতো উঁচু হয়ে আছে। ভদ্রলোক সোফায় বসা মাত্র বিকাশ উঠে দাঁড়াল:

ভদ্রলোক ঘাবড়ে গিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'কি হল আপনার?'

'আমার পছন্দ হল না।' বিকাশের সবাসরি উত্তর।

'কি করে। আপনি তো আমার বোনকে এখনও দেখেননি।'

বিকাশ একটু থতমত খেয়ে গেল। আমরা দু'জনেই ভদ্রলোককে পিতা ভেবেছিলুম।

মেয়ের দাদা বললেন, 'আমার বোনকে আগে দেখুন, তারপর তো পছন্দ অপছন্দ।'

বিকাশ বললে, 'শুধু শুধু আর কষ্ট দিয়ে লাভ নেই। আপনাকে দেখেই আমার ধারণা তৈরি হয়ে গেছে। ধরে নেওযা যেতে পারে আপনার মতোই হবে। আপনারই স্ত্রী সংস্করণ।'

ভদ্রলোক বেশ আহত হয়ে বললেন, ছিঃ, চেহাবা তুলে কথা বলবেন না। ওটা এক ধরনের অসভ্যতা।'

আমি বললুম, 'আমার বন্ধুর কোনও দাবি-দাওয়া নেই. পছন্দ হলেই পত্রপাঠ কাজ সারবে; তবে ওর একটাই শখ বউ যেন সুন্দবী হয়।'

ভদ্রলোক বললেন, 'আমাকে দেখে আমার বোন সম্পর্কে কোনও ধারণা করলে ভুল করবেন। সে কিন্তু প্রকৃতই সুন্দরী।'

বিকাশ বললে, 'ও ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারল না। আমি শুধু সুন্দরী মেয়েই চাই না, আমি চাই সুন্দরের বংশ। আপনি আমার শ্যালক হলে পরিচয় দিতে পারব না। লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাবে।'

ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'গেট আউট। আভি নিকালো হিঁয়াসে।'

আমরা এক দৌড়ে রামরাজাতলার রাস্তায়। ভদ্রলোক এই ভদ্রতাটুকু অন্তত করলেন, যে রাস্তা পর্যন্ত তেড়ে এলেন না। এলে পাবলিক আমাদের পিটিয়ে লাশ করে দিত। বেশ কিছু দূরে একটা চায়ের দোকানে বসে, চা খেতে খেতে বিকাশকে বললুম, 'তাহলে আরও কিছু নতুন সর্ত যোগ হল।'

'হলই তো। একটা পয়সাও যখন নোবো না, তখন বুক ফুলিয়ে মাথা উঁচু করে বিয়ে করব। অনেকে কি করে জানিস তো, মেয়ের এক একটা ডিফেকটের জন্যে টাকা দাবি করে। একটু খাটো মাপের, দু হাজার। নাক থেবড়া, পাঁচ হাজার। চাপা রঙ তিন হাজার। সামনের দাঁত উঁচু সাত হাজার। পৃথিবীটা লোভী মানুষে ছেয়ে গেছে। অনেকে দেখবি ওই কারণে ওই রকম মেয়েই খোঁজে। বিয়ে নয় ব্যবসা।'

'তুই মেয়েটিকে না দেখে ওই রকম একটা অভদ্র কাণ্ড করলি কেন?'

'শোন লুঙ্গি পরা শ্বশুর, ভুঁড়িঅলা শালা, দাঁত বড় শাশুড়ী, এই সব আমার চলবে না। আমি যে বাড়ির জামাই হব সে বাড়িতে যেন চাঁদের হাটবাজার হয়।'

'বাড়িতে লুঙ্গি পরা চলবে না?'

'না, লুঙ্গি অতি অশ্লীল জিনিস। আমার শ্বশুরকে ড্রেসিং-গাউন পরতে হবে।'

'বেশ ভাই, যা ভাল বোঝো তাই করো।'

'সব সময় একটু দূর ভবিষ্যতের দিকে তাকাবি। ধর বিয়ের পর আমাদের একটা গ্রুপ ফটো তোলা হল। আমার পাশে হিড়িম্বা, আমার সুর্পনখা, পেছনে ঘটোৎকচ, তার পাশে হিরণ্যকশিপু। কেমন লাগবে!'

বেশ কিছুদিন কেটে যাবার পর শুকচরে আবার একটি মেয়ে দেখতে যাওয়া হল। সেও বেশ সাবেক কালের বাড়ি। বনেদী বাড়ি। লোকজন নেই বললেই চলে। বাড়ির আকার আকৃতি দেখলে মনে

হয়, শতাব্দীর শুরুতে এই গৃহ ছিল শতকণ্ঠে মুখর। উঠানের পাশে ভেঙে পড়া একটি বাড়ির কাঠামো দেখে মনে হল, এখানে একসময় একটি আস্তাবল ছিল। আমার অনুমান সত্য প্রমাণ করার জন্যে পড়ে আছে কেরাফি গাড়ির দুটি ভাঙা চাকা। বিকাশেব কি মনে হচ্ছিল জানি না, আমার মনে ভিড় করে আসছিল অজস্র মুখস্মৃতি। মনে হচ্ছিল আমি যেন ইতিহাসে ঢুকে পড়েছি। আমার ভীষণ ভাল লাগছিল। সামনেই চণ্ডীমণ্ডপ। ভেঙে এলেও,অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। পরিচ্ছন্ন। দেয়ালে টাটকা স্বস্তিকা চিহ্ন দেখে বুঝতে পারলুম এখনও পূজাপাঠ হয়। উঠানের একপাশে ফুটে আছে এক ঝাঁক কৃষ্ণকলি আর নয়নতারা। ভীষণ ঘরোয়া ফুল। দেখলেই মনে হয় দুঃখের মধ্যে সুখ ফুটে আছে। যে সব পবিবার, বড পরিবার ভেঙে গিয়েও নতুন করে বেঁচে আছে, নতুন ভাবে, তাঁদের সেই অতীত বর্তমানের জমিতে ফুটে থাকে কৃষ্ণকলি হয়ে। বিশাল দরজা, ততোধিক বিশাল উঠান পেরিয়ে আমরা চলেছি। তখনও মানুষজন চোখে পড়েনি। ভেতরের বাড়িতে সবাই আছেন। দূরে কোথাও একটা গরু পরিতৃপ্ত গলায় ডেকে উঠল। এই ডাক আমার চেনা। এ হল গরবিনী গাভীমাতার ডাক। আমি জাতিস্মব নই, তবু মনে হতে লাগল এই বাড়ি আমার অনেক কালের চেনা।

ভেতর বাডিতে পা রাখা মাত্রই শীর্ণ চেহারার এক ভদ্রলোক ছুটে এলেন। শীর্ণ কিন্তু সুশ্রী। ভদ্রলোকের পরিধানে পাজামা ও পাঞ্জাবি। মুখে ভারি সুন্দর হাসি। এক মাথা ঘন কালো চুল। ভেতরের বাড়িটা যাকে বলে চক মেলানো বাড়ি, হয়তো সেই বাড়িই ছিল এক সময়। দেখেই মনে হল বাড়িটা ভাগাভাগি হয়ে গেছে। ভদ্রলোক আমাদের নিচের তলার ঘরে নিয়ে এলেন। বিশাল বড় ঘর। শ্বেত-পাথরের মেঝে। ঘরে তেমন আসবাবপত্র নেই। কার্পেট ঢাকা একটি চৌকি পাতা। ভদ্রলোক আমাদের বসিয়ে দ্রুতপায়ে ভেতরে চলে গেলেন।

বিকাশকে জিজ্ঞেস করলুম, 'কি মনে হচ্ছে? তোমার ষষ্ঠ অনু-

ভূতি কি বলছে ?'

'পড়তি !'

'আর পড়বে না, এখন একটা জায়গায় এসে আটকেছে। আর তোমার তো দাবি-দাওয়া নেই।'

'দাবি না থাক, এই ভাঙা গোয়ালে কে বাসর পাতবে। সাপে কামড়ালে কে বাঁচাবে ভাই। লক্ষ্মীন্দরেব বাসর হয়ে যাবে। আমার ষষ্ঠ অনুভূতি বলছে, এই বাড়িতে কম সে কম এক হাজার জাত সাপ আছে।'

বিকাশের কথায় গা জ্বলে গেল। আমাদের সঙ্গে রকে বসে আড্ড মারতো। চা, চপ খেত। হঠাৎ ভাল একটা চাকরি পেয়ে মাথা বিগড়ে গেছে। ধরাকে সরা জ্ঞান। মনে মনে বললুম—যা ব্যাটা মরগে যা। বিকাশের ওপর আমার একটা ঘৃণা আসছে।

ভদ্রলোক নিজেই একটা ট্রে দু'হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। তার ওপর সাধারণ দুটো কাঁচের গেলাস। গেলাসে ডাবের জল। ট্রেটা সামনে রেখে সাবধানে গেলাস দুটো আমাদের হাতে তুলে দিলেন। বিকাশ ডাঁট মারতে শুরু করেছে। গেলাসটা এমন ভাবে নিল, যেন দয়া করছে। কার্পেটের একপাশে রেখে ভারিক্কি গলায় বললে, 'এই সব ফর্মালিটি ছেড়ে, কাজের কাজ সারুন। আমার অনেক কাজ আছে।'

ভদ্রলোক সবিনয়ে বললেন,'নিশ্চয় নিশ্চয়। তবে দূর থেকে আসছেন, গরমকাল, এখনও কিছু পিতার আমলেব নারকেল গাছ আছে। খেয়ে দেখুন, খুব মিষ্টি জল।'

'ও জলটল পরে হবে, দেখাদেখিটা সেরে নিন।'

ভদ্রলোক বিষণ্ণ বিব্রত মুখে ভেতরে চলে গেলেন। আমি বিকাশকে বললুম, 'তোব সঙ্গে আর আমি যাব না কোথাও। এবার তুই ছোটলোকমি শুরু করেছিস।'

'ছোটলোকমির কি আছে। আমার এই রোগা রোগা চেহারার পড়তি বড়লোকদের বিশ্রী লাগে। বিনয়ের আদিখ্যেতা। স্পষ্ট

উচ্চারণে নিচু গলার কথা।’

‘তাহলে এলি কেন, খামোখা একটা মানুষকে অপমান করাব জন্যে।’

‘জানবো কি করে?’

একটা চেয়ার নিয়ে ভদ্রলোককে আসতে দেখে এগিয়ে গেলুম। ভারি চেয়ার। একা সমলাতে পারছেন না।

‘সরুন আমি নিয়ে যাচ্ছি। আপনি বইছেন কেন! আর কেউ নেই?’

‘না, আমাকে সাহায্য করার মতো কেউ নেই। আমার চেহারা দেখে আপনি বুঝতে পারবেন না। আমি খুব খাটতে পারি।’

চেয়ারটাকে জানলার পাশে আমাদের দিকে মুখ করে রাখা হল। কিছু পবেই তিনি পাত্রীকে নিয়ে এলেন। সাজগোজের কোনও ঘটা নেই! ফিকে নীল শাড়ি। হাতাঅলা সাদা ব্লাউজ। চুলে একটা এলো খোঁপা। কপালের মাঝখানে ছোট্ট একটি টিপ।

মেয়েটি নমস্কার কবে চেয়ারে বসল। পুরো ব্যাপারটাই অস্বস্তি-কর। বোকা বোকা হৃদয়হীন নির্দয় একটা ব্যাপার। দুজোড়া চোখ প্রায় অসহায় একটি মেয়েকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে! আমি সেভাবে না দেখলেও বিকাশ অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে দেখছে। মাপজোক করছে। সুন্দরী বউ চাই। ডানাকাটা পরী চাই। লেখাপড়ায়, চাকরিতে বাল্যবন্ধু সোমেন মেবে বেরিয়ে গেছে। হেরে আছে এক জায়গায় বিয়েতে। পেয়েছে খুব, কিন্তু বউ নিখুঁত সুন্দরী নয়। বিকাশ বউ দিয়ে মেবে বেরিয়ে যাবে!

মেয়েটি মুখ নিচু করে বসে আছে। ভদ্রলোকের মুখের আদলের সঙ্গে মেয়েটির মুখ মেলে। ধারালো অভিজাত মুখ। চাঁপা ফুলের মতো গাত্রবর্ণ। লম্বা ছিপছিপে বেতসলতার মতো চেহারা। ভারি সুন্দর। বেশ একটা মহিমা আছে। অন্তত আমার চোখে। মেয়েটিকে খুব নম্র ও ভীক মনে হল। বসে আছে অসহায় অপরাধীর মতো।

ভদ্রলোক বলতে লাগলেন, ‘ছেলেবেলায় দিদি আর জামাইবাবু

মারা যাবার পর আমার এই ভাগনী আমার কাছেই মানুষ। তখন আমাদের সাংঘাতিক দুরবস্থা। তবু আমি আমার কর্তব্য করে গেছি। পড়িয়েছি। গান শিখিয়েছি। সভ্যতা, ভদ্রতা, সংসারের যাবতীয় কাজ শিখিয়েছি। একটাই আমি পারিনি। তা হল ভাল করে খাওয়াতে পারিনি। তার জন্যে দায়ী আমাদের অভাব। আমার রোজগার করার অক্ষমতা। তবে এই গ্যারান্টি আমি দিতে পারি, এমন মেয়ে সহজে পাবেন না। দুঃখের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বড হয়েছে। ওদিকে বড় ঘরে সংস্কারও কাজ করেছে। মেয়েটিকে আপনারা গ্রহণ করুন। আমার শরীর ক্রমশই ভেঙে আসছে।'

বিকাশ ফট করে উঠে পডল। একেবারে আচমকা!

ভদ্রলোক অপদস্থ হয়ে বললেন, 'কি হল! আমি কি কোনও অন্যায় করে ফেললুম।'

বিকাশ একেবারে গুলি ছোঁড়ার মতো করে বললে, 'যে মাল বিজ্ঞাপনের জোরে বিকোতে হয় সে মাল ভাল হয় না।'

মেয়েটি শিউরে উঠল।

ভদ্রলোক বললেন, 'এ কি বলছেন আপনি!'

'ঠিকই বলছি। আপনার ভাগনীর স্ত্রীরোগ আছে।'

আমার পক্ষে সহ্য করা আর সম্ভব হল না। সমস্ত শক্তি এক করে বিকাশের ফোলা ফোলা গালে ঠাস করে এক চড় মারলুম। আর একটা চড় তুলেছিলুম। ভদ্রলোক ছুটে এসে আমার হাত চেপে ধরলেন। উত্তেজনায় কাঁপছেন। বিকাশের নিতম্বে কষে একটা লাথি মারার বাসনা হচ্ছিল। বিকাশ মুখে, অহংকার প্রবল, শরীরে দুর্বল। হনহন করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

আমি ফিরে তাকালুম। ভীরু মেয়েটির ঠোঁট ভয়ে সাদা হয়ে গেছে। বড় বড পাতা ঘেরা চোখে জল টলটলে। সেই মুহূর্তে ভেতরের বাড়িতে শাঁখ বেশে উঠল। পুজো হচ্ছে গৃহদেবতার। ঘণ্টা বাজছে টিং টিং করে। আমি পিছোতে পিছোতে চৌকিটার ওপরে গিয়ে বসলুম। আমার ভীষণ একটা তৃপ্তি হয়েছে। একটা অসভ্য

একটা ইতরকে আমি আঘাত করতে পেরেছি। অসীম সুখে আমার মন ভরে গেছে।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে যখন শাঁখ আর ঘণ্টা বাজছে পুজোর ঘরে, আমি আমার জীবনের সবচেয়ে সাংঘাতিক একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললুম। ভদ্রলোককে বললুম, 'আপনি দিন দেখুন' আমি বিয়ে করব। আমি বড় চাকরি করি না তবে মানুষ। বিয়ে এখন বড়লোকের ব্যবসা, তবু আমি এই ঝুঁকি নেবো। আমার পিতা এসে পাকা কথা কয়ে যাবেন। হ্যাঁ তার আগে আপনার ভাগনীকে জিজ্ঞেস করুন আমাকে পছন্দ কি না?'

ভদ্রলোক আমার কাঁধে হাত রাখলেন; তখনও হাত কাঁপছে।

মেয়েটি অস্ফুটে বললে, 'আপনাকে আমি চিনি।'

'কি করে।'

'আমি বইয়ে পড়েছি এমন চরিত্রের কথা।

'আমি বাস্তব নই!'

'কাল বোঝা যাবে।'

মেয়েটি পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ; তাপর ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

ভদ্রলোক আবেগের গলায় বললেন, 'তুমি বাস্তব হবে তো!'

হাতের প্যাঁচ

ছোট, মাঝারি, বড়, কি গল্প আপনি চান বলুন, পেশাদার কলম ঠিক নামিয়ে দেবে। কত স্লিপ? আজকাল তো আর সাহিত্য নেই, আছে স্লিপ। সম্পাদক মহাশয়রা আজকাল আর লেখা চান না। লেখা আজকাল আবার একসঙ্গে আসে না। বড় বড় লেখকরা স্লিপ দিতে থাকেন। সম্পাদক মহাশয়রা প্রশ্ন করেন,'কাল ক' স্লিপ দিচ্ছেন।

অন্তত পাঁচ স্লিপ দিন।' সাহিত্যের জগতে আর ফলপাকড়ের জগতে বিপ্লব ঘটে গেছে। আগে আম বিক্রি হত, টাকায় পাঁচটা হিসেবে। এখন পনের টাকা কিলো। লিচু বিক্রি হত শ' দরে। লিচুরও এখন কিলো। যুগ পালটে গেছে।

আমি একটা বড় গল্প লেখার বায়না পেয়েছি। চল্লিশ স্লিপ। তার কম বা বেশি নয়। সেদিন সরকারী অফিসে লিফটে উঠেছিলুম দেখি লেখা রয়েছে সিকস্টিন পার্সনস। প্রশ্ন জাগল, হাতির মতো চেহারার ষোলজন উঠলে কি হবে। নির্দেশ অনুসারে তো ষোলজনই হল। চল্লিশ স্লিপে যদি চল্লিশ চল্লিশ হাজার শব্দ হয়ে যায়। সে তো তাহলে উপন্যাসই হয়ে গেল।

বড গল্প কাকে বলে আমি জানি না। ছোট গল্পকে টেনে বাড়ালেই মনে হয় বড় গল্প হয়। আউব থোডা হেঁইয়ো বড় গল্প হুইল। উপন্যাস, উপন্যাস একটা ভাব থাকবে। যেমন শীত-শীত ভাব। ছুঁচো আব হাতি। ছুঁচো দেখে এক পণ্ডিত বলেছিলেন, এ হল রাজার হাতি, না খেয়ে খেয়ে এই রকম হয়ে গেছে। আর হাতি দেখে বলেছিলেন. এ ব্যাটা রাজার ছুঁচো, খেয়ে খেয়ে অমন হয়েছে। ছোট গল্প আর বড় গল্প। একই ব্যাপার।

কি গল্প লেখা হবে। প্রেমের গল্প। বিচ্ছিন্নতার গল্প। হতাশার গল্প। রাজনৈতিক গল্প। নাকি ভূতের গল্প! প্রেমের গল্পই চেষ্টা করা যাক। গল্প আর রান্না একেবারে এক জিনিস। নানা উপাদান। নানা মশলা। তারপর আগুনে চাপিয়ে নাড়াচাড়া। যাকে বলে হেলুনি মারা। বা কষা। মাংস যত কষবে ততই তার প্রাণমাতানো গন্ধ বেরোবে। এক এক রান্নার এক এক উপাদান। প্রেমের গল্পের প্রধান উপাদান হল, একজন প্রেমিক আর একজন প্রেমিকা। যেমন ডিমের কারির প্রধান উপাদান হল, ডিম আর পেঁয়াজ। মাংসের কলিয়ার প্রধান উপাদান হল, মাংস আর আলু।

একজন প্রেমিক আর একজন প্রেমিকা। যেন আলু আর পটল, ভাসছে জলে। জল হল সমাজ। এরপর মশলা চাই। তেল চাই,

নুন চাই। তা না হলে, তরকারি না হয়ে, হয়ে যাবে আলু সেদ্ধ। পটল সেদ্ধ। শুধু প্রেমিক,প্রেমিকাকে নিয়ে কত দূর যাওয়া যায়। কত কথাই বা বলানো যায়। মিতালি, আমি তোমাকে ভালোবাসি। সোমেন, আমি তোমাকে ভালবাসি। এ ভাবে বেশিক্ষণ চালানো যায় না। তা ছাড়া একালের প্রেমে ভালবাসা শব্দটাই উচ্চারিত হয় না।ন্যাকা ন্যাকা শোনায়।অ্যাকসানের যুগ। ধর তক্তা,মার পেরেকের যুগ। মধ্যযুগের প্রেমে, অনেক হিলি হিলি, বিলি বিলি কাণ্ড হত। পাতার পর পাতা কবিতা। ফুল। কোকিলের ডাক। চাঁদ। সরোবর। বাতাস। দীর্ঘশ্বাস। মধ্যযুগের প্রেমে বিরহের ভাগ ছিল বেশি। কারণ, তখন, ফ্রি মিকসিং ছিল না। প্রেমিক আর প্রেমিকায় মুখোমুখি দেখা হওয়ার উপায় ছিল না। বারান্দায় প্রেমিকা ল্যাম্পপোস্টের তলায় প্রেমিক। যমুনায় জল ভারতে চলেছেন প্রেমিকা, গাছর ডালে পা ঝুলিয়ে বাঁশি বাজাচ্ছেন প্রেমিক। নিশি জাগছেন রাই,কবি গাইছেন, তুমি যার আসার আশায় আছো, তার আসার আশা নাই। নট-ঘট শ্যামরায় চলিল আজ মথুরায়। প্রেমের এই ফোঁসফোঁসানি একালে অচল। দেহাতীত প্রেম কেউ বিশ্বাস করবে না।সমালোচকরা তুলো ধুনে দেবেন। প্রেমের সঙ্গে সেক্স চাই-ই চাই। রূপ বর্ণনায় এখন কবিতাও হয় না। গদ্য-সাহিত্য তো দূরের কথা। 'চুল তার কবেকার,—একটা সময় পর্যন্ত বেশ ছিল। এখন খোলাখুলির যুগ। একালের সিনেমায় জোড়া ঠোঁটের মাঝখানে আর যোজন তিনেকের ব্যবধান থাকে না। চুম্বক আর লোহা-সম কাছাকাছি হওয়া মাত্রই টানাটানি। জোড়াজুড়ি।

আমার উপাদান আমি গুছিয়ে ফলি। বেকার প্রেমিক, বেকার প্রেমিকা।প্রেমিকের পিতার কারখানায় চলেছে লাগাতার ধর্মঘট। মা বাতের রুগী। যত না কাজ করেন, কোঁত পাড়েন তার চেয়ে বেশি। আর সূর্য ওঠা থেকে,মশারিতে ঢোকা পর্যন্ত ঝগড়া করেন প্রাণ খুলে। প্রেমিকের একজন অবিবাহিতা বোন থাকবে। যুবতী। ম্যাগনাম স্বাস্থ্যের অধিকারী। পথে বেরনো মাত্রই দশবিশটা নানা চেহারার,

নানা পোশাকের ছেলে পেছন পেছন চলতে থাকে। লেজের বদলে রুমাল নাড়ে। প্রেমিক ভাড়া থাকবে দু কামরার একটি বাড়িতে। একটি ঘর বড়। একটি ঘর ছোট। বাথরুম কমন। সব লেখকই আশা করেন, তাঁর গল্প নিয়ে সিনেমা হোক। কোন ভালো পরিচালকের হাতে পড়ুক। কাহিনীকে প্রথম থেকেই সেই কারণে ক্যামেরার চোখে দেখতে হবে। সিনেরিয়ো করতে করতে এগোতে হবে। সামান্য বাম-বাম ভাব থাকা চাই। ক্যাপিট্যালিস্ট প্রেম নিয়ে হিন্দি ব্যাণিজ্যিক ছায়াছবি হতে পারে। তাতে পয়সা আছে, সম্মান নেই।

আমার এই কাহিনী যখন মুভি-ক্যামেরা ধরবে তখন শুরুর শটটা হবে এইরকম ঃ

ধোঁয়া। ভলকে ভলকে ধোঁয়া। আকাশে উঠে এলো চুলের মতো খুলেখুলে যাচ্ছে। নরম ধোঁয়া। মধ্যবিত্ত ধোঁয়া। মারোয়াড়ির বেআ-ইনি গুদামে আগুন-লাগা ধোঁয়া নয়। কয়েক জোড়া উনুনেব ধোঁয়া একসঙ্গে আকাশে উঠছে। সেই আকাশে উড়ছে-বাবু-কলকাতার পায়রা। পায়রা ছাড়া ভালো ছবি হয় না। পায়রা হল প্রতীক। ভালো-ভাবে লাগদাঁই করে লাগাতে পারলে একটা কেলেঙ্কারি কাণ্ড হয়ে যায়। পায়রা দিয়ে মৃত্যু খুব সুন্দর বোঝানো যায়। সিনেমার মৃত্যু বড় হাস্যকর। না মরলে মরা কেমন করে মরার মতো হবে? সব কিছুর অভিনয় সম্ভব, মৃত্যুর অভিনয় অসম্ভব। অভিনেতাদের কাছে মৃত্যু একটা কঠিন সাবজেক্ট। মরিছ না, অথচ মরতে হচ্ছে। ক্যামেরা সরে গেলেই উঠে বসে, কই রে সিগারেট নিয়ে আয়, নিয়ে আয় জোড়া ওমলেট, ডবল হাফ চা। যে মৃত্যুর পর মানুষকে শ্মশানে গিয়ে চিতায় শুতে হয়, এ মৃত্যু নয়। এ হল গিয়ে পরিচালকের নির্দেশিত মৃত্যু। ক'জন আর মৃত্যুকে সে-ভাবে দেখার সুযোগ পান। মৃত্যু ঘটে নিভৃতে, একান্তে। মৃত্যু মানুষের বড় ব্যক্তিগত ব্যাপার। একান্ত আপনজন শিয়রে বসে থেকেও বুঝতে পারে না, মানুষটা কখন কিভাবে হঠাৎ চলে গেল, তার দেহ-জামাজোড়া ছেড়ে সেই শ্বাসকষ্ট, সামান্য এক চিলতে বাতাসের জন্যে ভেতরের আকুলি-

বিকুলি। দুটো চোখের ঠেলে বেরিয়ে আসা। চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে ঊর্ধ্বনেত্র হলেই কি আর মৃত্যু হল। সেই কারণে সিনেমার মৃত্যু সব একই ধরনের। মাথাটা বালিশ থেকে উঠতে উঠতে ধপাস করে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আবহ সংগীত। বেহালায় প্যাথসের টান। ক্যামেরা ক্লোজ-আপে অভিনেতার মুখ ধরছে। অভিনেতার তখন অগ্নি-পরীক্ষা। তারস্বরে চিৎকার—'চোখের পাতা পিটপিট করে না যেন, ডাবাড্যাবা ঊর্ধ্বনেত্র।' এই একটা শটই যে কতবার রি-টেক করতে হয়। কখনও পাতা পড়ে যায়, কখনও ড্যাবা কমে আসে, কখনও মৃতের চোখে জল এসে পড়ে। সেই কারণে মৃত্যুর আজকাল একটা পেটেন্ট চেহারা হয়েছে সিনেমার পর্দায়। সেকেণ্ড-গ্রেড পরিচালকরা তার বাইরে আসতে পারছেন না। প্রথম সারির পরিচালকরা মৃত্যুকে নিয়ে গেছেন আর্টের পর্যায়ে। তাঁরা করেন কি, ক্যামেরাকে ক্লোজ-আপে এনে মৃত্যু-পথযাত্রীর মুখটা ধরেন। ছটফট, ছটফট, বালিশে মাথা চালাচালি, দু'হাত কোনও রকমে ওপরে তুলে কারোকে ধরার বা খোঁজার চেষ্টা। অস্ফুটে কারোর নাম ধরে ডাকা, 'সুধা! সুধা!' তারপর একপাশে ঘাড় কাত করে এলিয়ে পড়া। কাট্। পরের শট্ ফড়ফড ফড়ফড় এক ঝাঁক পায়রা যেন কারোর তাড়া খেয়ে আকাশে উড়ে গিয়ে, বিশাল বৃত্ত রচনা করে উড়তে লাগল। এরপর এক রাউণ্ড আন্তরিক কান্না। কান্নার দৃশ্যে আমাদের অভিনেত্রীদের কোনও জুড়ি নেই। একেবারে ফাটিয়ে দিতে পারেন। যাকে বলে কেঁদে মাত করা; অনেক পরিচালক আবার রেলগাড়ির সাহায্য নেন। সিটি বাজিয়ে হুহু করে ট্রেন চলে গেল দূর থেকে দূরে। বুক কাঁপিয়ে। লোহার রেলে চাকার শব্দ। মন হু হু করানো সিটি। সব মিলিয়ে এমন একটা এফেক্ট। আত্মা রেলে চেপে পরবাস থেকে চলেছে স্ববাসে। পায়রা দিয়ে জমি-দারের লাম্পট্য বোঝানো যায়। চকমেলানো বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে পায়রাদের দানা খাওয়াতে খাওয়াতে বয়স্যকে বলছে, ওই অমুকের স্ত্রীকে তাহলে আজ রাতেই তোলার ব্যবস্থা করো। আবার জোত-

দারের অত্যাচার বোঝবার জন্যে বেড়াল আর পায়রা একসঙ্গে ব্যবহার করা হয়। বাড়ির চালে লাউ ফলে আছে। তার আড়াল থেকে গুটি গুটি বেরিয়ে আসছে পাঁশুটে রঙের একটা বেডাল ইয়া এক হুলো। আর অদূরে নিশ্চিন্ত মনে ঠোঁট দিয়ে ডানা পরিষ্কার করছে নিরীহ এক পায়রা। দর্শকের আসনে বসে আতঙ্কে আমাদেব শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। মানুষের সামগ্রিক নিপীড়ন বোঝাতে ক্রুশবিদ্ধ যীশু তো হামেশাই পর্দায় আসেন।

এখন হল প্রতীকের যুগ! লোগোর যুগ। অলিম্পিক, এশিয়ান গেমস, এক একবার, এক একরকম লোগো। কোনওবাব হাতি। কোনওবার ভাল্লুক। কোনওবার গোল গোল চাকা। তা আমাব কাহিনীব চিত্ররূপে প্রথমেই থাকবে পর্দাজোডা নরম, মিষ্টি, ধোয়া তার উপর দুলতে থাকবে টাইটেল। আবহ হিসেবে ব্যবহৃত হবে দমকা কাশির শব্দ, কাকের কর্কশ চিৎকার। ব্যাটারি ডাউন গাড়িব বারে বারে স্টার্ট নেবাব চেষ্টায় সেল্‌ফ মাবার শব্দ। দুপক্ষের কদর্য ঝগড়াব অস্পষ্ট আওয়াজ। বেতাবে প্রভাতী সংগীত। কলতলায় বাসন ফেলাব আচমকা শব্দ। কোন বস্ত্র ব্যবহার করা হবে না। স্রেফ শব্দ। বাজারের কোলাহল। কলের বাঁশি। সব মিলিয়ে তৈরি হবে টাইটেল মিউজিক। আজকাল বিদেশী বইতে এই কায়দাই চলেছে!

এইবার ক্যামেরা ছাদের ভাঙা আলসে বেয়ে, বারান্দার ভাঙা রেলিং বেয়ে নেমে আসবে শ্যাওলা ধরা চৌকো উঠানে। ক্লোজ আপে তিনটে তোলা উনুন। এই ভাঙা সাবেক বাড়িতে তিনটি পরিবার বাস করে। এখন সমস্যা হল বাড়ি তৈরির মতো গল্পটাকে আমি কিভাবে খাড়া করব। কুস্তির মতো গল্প লেখারও দুটো ধরন আছে— একটা হল, ফ্রি স্টাইল। অর্থাৎ শুরু করে দাও, তারপরে যেখানে যায় যাক। লিখতে লিখতে ভাবো, ভাবতে ভাবতে লেখো। শেষ পর্যন্ত গল্পের চরিত্ররাই লেখকের গলায় দড়ি বেঁধে হিড় হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে যায়। দিল্লিতে এক বিখ্যাত নামী লেখক বসবাস করতেন। খুব সায়েবী ভাবাপন্ন। তাঁর একটা বিশাল বড়

অ্যালসেসিয়ান কুকুর ছিল। রোজ সকালে সেই দুর্বল বুদ্ধিজীবী তাঁর সবল কুকুরটিকে নিয়ে প্রাতঃভ্রমণে বেরোতেন। প্রায়ই দেখা যেত, ব্যাপারটা উল্টে গেছে। কুকুরই বাবুকে নিয়ে বেড়াচ্ছে। টানতে টানতে যেদিকে নিয়ে যাচ্ছে, সেই দিকেই যেতে হচ্ছে। চরিত্র নিয়ে লেখক বেড়াতে বেরিয়েছেন, শেষে চরিত্ররাই লেখককে টানতে থাকে।

আর একটা হল কুস্তি। নিয়ম মেনে। প্রথা মেনে। কম্পোজ করে। স্টাইল বেস্টলিং। প্ল্যান করে লেখা। কার সঙ্গে কি হবে। গল্পর কাঠামোটা পুরো ভেবে নিয়ে, ঘড বেঁধে মাটি চডিয়ে যাও। সাহিত্যে আমরা যাকে গল্প বলি সিনেমায় সেইটাকেই বলে স্টোরি। আমার এই স্টোরি ফ্রি স্টাইলেই চলুক। আঁতেল গল্প সেই ভাবেই এগোয়। আমার যখন যা মনে হবে, তাই নামিয়ে যাবো, তারপর ফিনিশ করে,মেজে-ঘসে ছেড়ে দেবো। যেমন এখন আমার মনে হচ্ছে, গল্পের প্রেমিক, প্রেমিকা এই একই বাড়িতে বসবাস করবে। একটা তোলা উনুন প্রেমিক-পরিবারের, আব একটা তোলা উনুন প্রেমিকা-পরিবারের। এই দুটো উনুনই জীবনের প্রতীক। জীবন জ্বলছে গুমরে গুমরে। যত না পুড়ছে তার চেয়ে বেশি ধোঁয়া ছাড়ছে। এইবার তৃতীয় উনুনটি কার। তৃতীয় উনুনটা অবশ্যই আর একটি পরিবারেব, কিন্তু এই কাহিনীতে সেই পরিবারটিব কি ভূমিকা হবে?

এই পবিবারটিকেই আগে প্রতিষ্ঠিত করা যাক। বড় বড় সাহিত্যিক আর বাঘা বাঘা সমালোচক ও সমালোচিকাদের সঙ্গে সামান্য মেলামেশা করে একটা কথা শিখেছি চরিত্রকে, ঘটনাকে 'এশট্যাবলিশ' করা। আধ্যাত্মিক জগতের ভাষায় বলে প্রাণ প্রতিষ্ঠা। মূর্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা। প্রথমত, চরিত্রকে এমনভাবে আঁকতে হবে, যেন বইয়ের পাতা থেকে তার শ্বাসপ্রশ্বাস আমাদের গায়ে এসে লাগে। যেন চিমটি কাটলে, উঃ করে ওঠে। জনৈক প্রখ্যাত প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিককে প্রশ্ন করেছিলুম, আপনার একটি চরিত্র আর একটি চরিত্রকে বলবে, 'সুধা আমার ভীষণ মাথা

খরেছে।' তা সেই কথাটা বলে ফেললেই হয়; তা না, সুধাময় আসছে রাস্তার একপাশ দিয়ে। কেন একপাশ দিয়ে আসছে, প্রায় এক প্যারা জুড়ে তার ব্যাখ্যা। সুধাময় সাবধানী। তার পিতাও খুব সাবধানী ছিলেন। সুধাময়ের এক বন্ধু,বড়দিনে পার্ক স্ট্রীটে কথা বলতে বলতে হাঁটতে হাঁটতে অন্যমনস্ক হয়ে পাশে সরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রানওভার হয়ে গিয়েছিল। সে দৃশ্য সুধাময় আজও ভুলতে পারেনি। রক্তাক্ত থ্যাঁতলানো একটা দেহ। সুধাময়ের একটা প্রশ্নের পুরো জবাব সমাপ্ত করে যেতে পারেনি। সে হাসছিল। হাসতে হাসতে নিমেষে মারা গেল। ওই একটা ঘটনায় সুধাময়েব পাকাপাকিভাবে নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়ে গেছে। পেছন থেকে গাড়ির শব্দ এলেই সে লাফিয়ে পাশে সবে যায়। এত পাশে, যে একবার নর্দমায় পডে পা ভেঙে তিন মাস বিছানায় পড়েছিল। এই ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গে সুধাময় চলতে চলতে বাড়ির দেরগোড়ায় পৌঁছে গেল। দেখলে, দূর থেকে একটা হলদে ট্যাকসি আসছে। পেছনের আসনে প্রশান্তর বোন বসে আছে। এয়ার হোস্টেস। ভীষণ অহঙ্কারী। এক সময় সুধাময়ের ছাত্রী ছিল। মেয়েটিব খোঁপার দিকে সুধাময়ের দৃষ্টি চলে গেল। সে নিজেকে তিরস্কার করল। মেয়েদের খোঁপা, তাও আবার ছাত্রী. সেই খোঁপার দিকে এই বয়সে নজর চলে যাওয়া খুবই অন্যায়। ট্যাকসিটা চলে যাবার পর সুধাময় রাস্তার দিকে তাকাল। একটা শালপাতার ঠোঙা উপুড় হয়ে পড়ে আছে। এই প্লাস্টিক আব কাগজের যুগে এই বস্তু এখনও আছে। সুধাময় নিজের সঙ্গে তুলনা করল। তার মতো মিসফিট মানুষের তুল্য এই ঠোঙা এখনও দু' একটা উপুড় হয়ে পড়ে থাকে। ঠোঙাটাকে একটা লাথি মেরে সুধাময় বেশ তৃপ্তি পেল। এই রকম একটা লাথি নিজের নিতম্বে মারতে পারলে সুধাময় খুব খুশি হত। নিজেকে নিজে লাথি মারা যায় না। এটাই এক দুঃখ। সেই বেড়াল ছানাটা একইভাবে বসে আছে দরজার বাইরে, একপাশে বাড়ি থেকে ভোরবেলা বেরোবার সময় যে-অবস্থায় দেখে গিয়েছিল, ঠিক সেই একই অবস্থায় বসে

আছে জড়োসড়ো হয়ে। দাঁতাল শূকরের মতো ভয়ঙ্কর এই পৃথিবীতে হঠাৎ এসে পড়ে ক্ষুদ্র এই প্রণীটি যেন স্তম্ভিত হয়ে গেছে। সুধাময়ের খুব ইচ্ছে করছিল অসহায়, ভীত প্রাণীটিকে তুলে ভেতরে নিয়ে যায়। ভয়ে পারলো না। পৃথিবীব ভয়ে নয়। ভয় সুধাকে। যে কোনও রোমশ প্রাণীর কাছাকাছি এলেই সুধার অ্যালার্জি হয়। রাতে হাঁপানির মতো হয়। নিঃসঙ্গ,ভীত বেড়ালটার কথা চিন্তা করতে করতে সুধাময় দোতলায় উঠতে লাগল। সিঁড়ির প্রতিটি ধাপের আগা ভেঙে ভেঙে গেছে। মেরামত অবশ্যই করা উচিত। একটু অন্যমনস্ক হলেই পতন অবধারিত। বহুবার পড়ে যেতে যেতে বেঁচে গেছে। সারাবার সঙ্গতি নেই। সুধাময় সিঁড়িটার নাম রেখেছে সচেতনতা। সুধাময় যৌবনে কবিতা লিখতো। অভ্যাসটা ধবে রাখতে পারলে কবি হিসেবে এতদিনে তার খুব নাম হত। সংসার তার এই প্রতিভাকে জাগাবার বদলে জল ঢেলে দিলে। সুধাময় বারান্দা পেরিয়ে ঘরে এল। বারান্দায় শেষ বেলার ছায়া নেমে এসেছে। সুধা শুয়েছিল খাটে। কপালে হাত রেখে। সুধাময় সেইদিকে তাকিয়ে বললে, 'তোমার আজও কি জ্বর আসবে?'

'ওই একই প্রশ্ন নিয়ে, আসার আগেই, জ্বরকে বিছানায় বরণ করবো বলে, শুয়ে পড়েছি।'

'আমি তোমাকে আগেও বলেছি, এখনও বলছি, মন থেকে জোর করে অসুখটাকে তাড়াও। তোমার একটা ম্যানিয়া এসে গেছে।' কপাল থেকে হাত সবিয়ে সুধা করুণ চোখে সুধাময়ের দিকে তাকাল। এই ম্যানিয়া শব্দটা শুনলে,তার ভেতরে একটা চাপা ক্রোধ ধিকিয়ে ওঠে। ক্ষতবিক্ষত সুধাময়ের দিকে তাকালে সেই ক্রোধ পরিণত হয় চাপা অভিমানে। দু চোখের পাশ দিয়ে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে আসে মাত্র। তার ভেতরের জলও শুকিয়ে আসছে ক্রমশ। সুধা আধবোজা চোখে দেখতে লাগল, সুধাময় পাঞ্জাবিটা খুলে হ্যাঙারে রেখে বারান্দার চেয়ারে গিয়ে বসল। সুধাময় ঠোঁটে একটা সিগারেট লাগল। সিগারেটের কাগজটা জড়িয়ে গেল ঠোঁটের সঙ্গে। বেশ

বুঝতে পারলো শরীর শুকিয়ে আসছে। সিগারেট খুলে নিতে গিয়ে অল্প একটু কাগজ ছিঁড়ে ঠোঁটেই লেগে রইল। সুধাময় দু'তিনবার থুথু করেও কাগজটা ছাড়াতে পারল না। তখন আঙুল দিয়ে ঠোঁট পরিষ্কার করে, জিভ বুলিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে সিগারেট লাগাল। ছেঁড়া অংশ দিয়ে কয়েক কুঁচি তামাক জিভে এসে গেল। সিগারেট খুলে সুধাময় আবার থু থু করল।

সুধা খাট থেকে ক্ষীণকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কি আবার গা গুলোচ্ছে। আমি কিন্তু তোমাকে বারে বারে বলছি, খালি পেটে থেকো না। তোমার পুরনো আলসার। এই সময় তুমি দয়া করে বিছানায় পড়ে যেও না। একটু কিছু মুখে দাও। কিছু না পারো তো, একটা বাতাসা, এক গেলাস জল।'

পর পর তিনটে দেশলাই কাঠি জ্বলল না। একটার বারুদ ঘসতে ঘসতে ক্ষয়ে গেল। একটা ভেঙে দু টুকরো হয়ে গেল। আর একটার বারুদ খুলে জ্বলতে জ্বলতে বারান্দার বাইরে ছিটকে চলে গেল। সুধাময় অবাক হয়ে দেশলাইটার দিকে তাকাল। এই রকম তো হয় না কখনো। সুধাময় সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিল বাইরে। ঘরে এনে খাটের পাশের চেয়ারে বসে পড়ল। ভুরুর মাঝখানের কপালটা দু আঙুলে টিপে ধরে বলল, 'সুধা, মাথাটা আজ ভীষণ ধরেছে। কপালের কাছটা একেবারে ছিঁড়ে যাচ্ছে।'

সেই প্রখ্যাত সাহিত্যিককে প্রশ্ন করেছিলুম, 'এই একটা কথা বলাতে আপনি কত কাণ্ড করলেন তাই না?'

'তুমি একটা আকাট মূর্খ! এইটুকু বোধ তোমার এল না, একে বলে বিল্ডআপ করা। ওয়ার্মিং আপও বলা যায়। একই সঙ্গে কত কি বোঝানো হল। এইটাই হল ক্ল্যাসিক্যাল স্টাইল। টমাস মান, আঁদ্রে জিদ, এই কায়দায় লিখতেন। গল্পের চরিত্রকে যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। তার ম্যানার্স, ম্যানারিজম্। চেহারার কোনও বর্ণনা নেই; কিন্তু যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, একহারা, সাধারণ উচ্চতার একটি লোক। এক সময় রঙ ফর্সা ছিল,

এখন তামাটে। সামনের চুল পাতলা হয়ে এসেছে। হাতে শিরা জেগে আছে। চোখ দুটো কোটরে ঢুকে গেছে। লোকটি সামান্য পরিশ্রমেই ঘেমে যায়। চোখ দুটো কোটরাগত হলেও অস্বাভাবিক উজ্জ্বল। চেহারায় একটা আভিজাত্যের ভাব এখনও ফুটে আছে। এই সমাজে লোকটি মিসফিট হলেও, অলস নয়, সংগ্রামী।'

কত কি শেখার আছে, তাই না! আমি তৃতীয় উনুনটিকে আগে এশট্যাবলিশ করি। ক্ল্যাসিক্যাল জার্মান-সাহিত্যিকদের কায়দায়। উনুন দিয়ে যেন মানুষ চেনা যায়? যেমন ছড়ি দিয়ে বাবু। দরজার পাল্লায় একটা ছড়ি ঝুলছে। লোকটির আর ঘরে ঢোকা হল না। বেরিয়ে গেল। অনেকটা পরে ফিরে এল একটা কুড়ুল নিয়ে। বউয়ের বিছানায় মহাজনের মুণ্ডু খুলে পড়ে গেল। সেই রকম অ্যাশট্রেতে পোড়া সিগারেট। স্ত্রীর প্রেমিকার সিগারেট অবৈধ ধোঁয়া ছাড়ে। শ্বশুর মহাশয়ের সিগারেট ছাড়ে তিরিক্ষি ধোঁয়া। বন্ধুর সিগারেটের মজলিশে ধোঁয়া। দারোগার সিগারেটের ধোঁয়ায় রুলের গুঁতো। ছেলের বন্ধুর সিগারেটের ধোঁয়া কেয়ার ফ্রি। পিতার সিগারেটের ধোঁয়ায় চাপা আতঙ্ক, এরপর জীবনমঞ্চে কোন্ দৃশ্য আসছে।

তৃতীয় উনুনটা ঢালাই লোহার। মাটির উনুন ধরে মায়ের বুকের স্নেহের আগুন। এই লোহার উনুন যেন বউ পোড়ানো আগুন। উনুনটার চেহারা যেন গেস্টাপোর মতো। সলিড লোহা। গোটা খসখসে। ভেতরের চাপা নিষ্ঠুরতা যেন ফুসকুড়ির মতো ফুটে উঠেছে। অন্য দুটো উনুনের চেয়ে এই উনুনের আগুন যেন বেশি লাল। প্রথম উনুনটি তুলে নিয়ে গেল সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী এক যুবক। প্রখ্যাত সাহিত্যিকের জার্মান কায়দায় যুবকটিকে একটু এশট্যাবলিশ করা যাক।

ছোট একটি ঘর। সেই ঘরে ইটের পর ইট দিয়ে উঁচু করা একটি চৌপায়া। আধময়লা একটি মশারি। সেই মশারির ভেতর যুবকটি শুয়ে ছিল। সাদা পাজামা আর কাঁধকাটা গেঞ্জি পরে। ছোট একটা

মাথার বালিশ। গামছা জড়ানো। গামছা জড়াবার কারণ, বালিশের খোলে দুটো ফুটো তৈরি হয়েছে। ফুটো হবার কারণ, এই পরিবারে একটা আদুরে বেড়াল আছে। সাদার ওপর হলদে। মুখটা ভারি মিষ্টি। পোখরাজের মতো জ্বলজ্বলে দুটো চোখ। লেজটা চামড়ার মতো মোটা। লোমে ভর্তি থুপথুপে একটা বেড়াল। বেড়ালটার পেট কোনও সময়ে ঢুকে থাকে না। সব সময় ভর ভরতি, সব সময় হাসিখুশি। হয় খাচ্ছে, না হয় ঘুমোচ্ছে। না হয় দুর্দান্ত খেলায় মেতে আছে আপনমনে। নানা রকম খেলা আবিষ্কার করার অসাধারণ প্রতিভা আছে বেড়ালটার। চাদরের ঝোলা অংশে ঝুলে ঝুলে খেলে। দেশলাইয়ের খালি প্যাকেট দু'পায়ে পাকা ফুটবলারের মতো ড্রিবল করে। হাওয়াই চটি চারপায়ে আঁকড়ে ধরে চিৎ হয়ে উল্টে পড়ে কামড়াতে থাকে। কখনও লেজটাকে ধনুকের মতো বাঁকিয়ে অকারণে ঘরময় ছোটাছুটি করে। হঠাৎ চমকে দাঁড়িয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে পেছনে তাকায়। তারপর আবার দৌড়োয়। তড়াং করে বিছানায় লাফিয়ে উঠে খচমচ, খচমচ এ-পাশে ও-পাশে দৌড়ে চাদরের ঝোলা ঝোলা অংশ বেয়ে ধুপ করে মাটিতে পড়ে। এই বেড়ালটাই বালিশটা ছিঁড়েছে। তাই অপরাধের জন্যে কেউ অসন্তুষ্ট হয়নি, বরং বেশ গর্বিত। ফুটো দিয়ে তুলো বেরিয়ে আসছিল, তাই যুবকটির মা নতুন একটা গামছা দিয়ে বালিশটা বেঁধে দিয়েছেন। মেয়েকে বলেছেন বালিশে দুটো তাপ্পি মেরে দিস। তার আর সময় হচ্ছে না। এটা তার অবহেলা নয়; সত্যিই সময়ের বড় অভাব। সৃষ্টি সংসারের কাজ, তিন বাড়িতে টিউশানি, রবীন্দ্রসংগীত শিখতে যাওয়া আর ছোট্ট একটা প্রেম। তার দোষ নেই। সত্যিই সময়ের অভাব।

সমস্ত কিছু ব্যাখ্যা করা উচিত। বেড়ালের অংশটাকে এত বড় করার কারণ, বেড়াল আর বিছানা একটা সংসারকে প্রকাশ করে। উচ্চবিত্ত, ভোগী, স্বার্থপরের সংসারে বিছানা খুব টিপটপ থাকে। বালিশের খুব বাহার। প্রত্যেকের আলাদা আলাদা ঘর। কলেজের

কমন রুমের মতো একটা লিভিং রুম। আলাদা খাবার ঘর। সেই সব বাড়িতে বিছানার ওপর চাঁদের হাটবাজার বসে না। সেই সব বাড়িতে বেড়াল ঢোকার উপায় নেই। ঢুকলেই দেখ্ মার। রাতের বেলায় টানটান বিছানায় শয্যাগ্রহণকারী আলতো করে শরীরটা ছেড়ে দেন। চাদর কুঁচকে শয্যার সৌন্দর্য্য নষ্ট হবার ভয়ে সাবধানে শরীর তুলে পাশ ফেরেন। এই ধরনের অধিকাংশ পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক তেমন ভালো থাকে না। বিয়ের তিন বছরের মধ্যে ডিভোর্স না হলে 'সোস্যাল প্রেস্টিজ' বাড়ে না। যে মহিলা যতবার ডিভোর্স করতে পারবেন ততই তাঁর সম্মান আর ব্যক্তিত্ব বেড়ে যাবে। সোসাইটির ওপর তাঁর একটা গ্রিপ এসে যাবে। তাঁর চুল তত ছোট হবে। জীবনে আর কুলিয়ে উঠতে পারেন না তাই নেড়ার আগের স্তরে এসে থেমে যান। যে পুরুষ যতবার ডিভোর্স করতে পারবেন, ডিভোর্সি মহলে তাঁর আকর্ষণ তত বেড়ে যাবে। মুখে একটা উদাসীনতা। কঠিন একটা পাকা পাকা ভাব। অর্থাৎ স্টিল থেকে টেম্পারেড স্টিল। সোনা থেকে পাকা সোনা। আনাড়ি স্বামী আর কি। মেয়েরা নেড়ে চেড়ে একটু ফ্রাই করে ছেড়ে দেয়। ফ্রায়েড হতে হতে ডিপফ্রাই হয়ে ঈশ্বরের কাটলেট। ডিভোর্সিদের একটা বৃত্ত থাকে। বৃত্তাকারে নৃত্য।

এ ছাড়ছে সে ধরছে। সে আমার ছাড়ছে তো ও ধরছে। এই ধরাধরি আর ছাড়াছাড়ি হতে হতে দেখা গেল সাত আট বছর পরে প্রথমাটি আবার প্রথমের কাছে ফিরে এসেছেন। তখন দুজনেই বলছেন 'কি আশ্চর্য মাইরি শুধু ওয়ার্ল্ড ইজ রাউণ্ড নয়, ম্যারেজ ইজ অলসো রাউণ্ড। চলো দাঁত বাঁধিয়ে আসি।'

আর বেড়াল। এরই মধ্যে এই কাহিনীতে দুটো বেড়াল এসে গেছে। প্রথম বেড়ালটি এসেছে উদাহরণে। সেই প্রখ্যাত সাহিত্যিক সুধাময়কে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে অসহায় একটি বেড়ালছানা এনেছেন! পৃথিবী হল গেস্টাপোর পায়ের বুটজুতো আর বেড়াল হল অসহায় জীব। এ কাহিনীর বেড়াল এই পরিবারের জীবনদর্শন।

অভাবের কুমির পরিবারটিকে চিউইংগামের মতো চিবোলেও মানুষ-গুলো ফ্যান-ফোন-ফ্রিজ-মারুতিঅলা পরিবারের সদস্যদের মতো নীচ আর সংকীর্ণ হয়ে যায়নি। ঐশ্বর্যশালীর নাস্তিকতা অথবা ভীত-আস্তিকতা নয়, মেঠো মানুষের সহজ-সরল ঈশ্বর-বিশ্বাসে পরিবারটি চালিত। গৃহকর্ত্রীর চিৎকার-চেঁচামেচি তাঁর বাইরের দিক, ভেতরে তুলতুলে সাদা ভাল্লুকের মতো, স্নেহ-ভালবাসা-মমতা-উদারতা ঘাপটি মেরে বসে আছে।

পাজামা আর গেঞ্জি-পরা যুবকটি যদি আমাদের এই কাহিনীর নায়ক হয় তাহলে তার কিছু গুণ থাকা চাই। ছেলেটি সম্প্রতি বাংলায় এম এ করেছে। ভীষণ সরল। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে সন্দেহবাদী নয়। বাঁচতে ভালবাসে। মানুষের সঙ্গে মিশতে ভাল-বাসে। অতীতের গল্প তাকে টানে। তার ভবিষ্যৎ হতাশায় ভরা নয়। বয়সের তুলনায় বুদ্ধি পাকেনি। সকলের সব কথাই সে বিশ্বাস করে। ঠকলেও তার জ্ঞান হয় না। ক্ষমাশীল। 'যাক গে, একটা দুটো লোক ওরকম করতেই' পাবে…বলে হেসে উড়িয়ে দেয়। বাবা, মা,বোন,তিনজনকেই সে খুব ভালবাসে। তিনজনের জন্যেই সে জীবন দিতে পারে। তার মৃত্যুভয় নেই। নিজে অসম্ভব কষ্ট করতে পারে সাজ-পোশাকের কাপ্তেনি তার অসহ্য লাগে, কিন্তু অতিমাত্রায় পরিচ্ছন্ন। সে অলস নয়, কিন্তু ঠেলে না তুললে, ভোরবেলা সে কিছুতেই বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে না। ঘুম থেকে ওঠার পরও নিজেকে ক্লান্ত মনে হয়। মনে হয়, সারা রাত সে যেন লড়াই করে উঠল। সে নিজেই বলে 'ডিংডং-ব্যাটল'।

এইবার ছেলেটির একটা সুন্দর নাম রাখা যাক। এমন একটি ছেলের নাম শঙ্কর ছাড়া আর কিছুই ভাবা যায় না। 'নিউমারোলজি' বলে একটা শাস্ত্র আছে বিজ্ঞানের বাইরে। সেই শাস্ত্র অনুসারে শঙ্কর নামের ছেলেরা ভাল হতে বাধ্য। এই যে শঙ্করের চরিত্রটা এই রকম হয়ে গেল, এরপর আর প্রেমের গল্প হয় না। এই ছেলে কখনও প্রেম করতে পারে না। কারণ শঙ্কর নিজের জামার

বুকপকেটে উদ্বোধন থেকে কেনা স্বামী বিবেকানন্দের ছোট্ট একটি ছবি রাখে। সত্যি রাখে। এটা গল্প নয়! মুভি ক্যামেরার বদলে এবার আমি নিজে আসরে নেমে পড়লুম। সেই ঘটনাটির মতো। শঙ্কর আমার গলায় চেন দিয়ে টানছে।

শঙ্করকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, 'তুমি স্বামীজীর ছবি সব সময় বুক পকেটে রাখো কেন? ভণ্ডামি! গলায় গুরুদেবের লকেট ঝুলিয়ে অনেক পরমার্থী দেহার্থী হয়ে বেশ্যালয়ে যায়।

'সে কে কি করে আমি জানি না। আমার জানার দরকার নেই। আমি একটা শক্তির স্পর্শ পাই বলে রাখি। একটা আদর্শ আমার হাত ধরে রাখে সব সময়। আমার হতাশা কেটে যায়। স্বামী বিবেকানন্দ হতে পারবো না কোনও দিন; কিন্তু তাঁর ত্যাগ,বিবেক-বৈরাগ্য যদি সামান্য স্পর্শ দিতে পারে আমাকে, এ জীবনে আমার কোন দুঃখ থাকবে না, হতাশা থাকবে না।'

'কেন তুমি তো ফোর্ড অথবা গেটি কি ওনাসিসের ছবি রাখতে পারো। তুমি একটা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কিংডম গড়ে তুলতে পারো। ত্যাগ তো নেগেটিভ অ্যাপ্রোচ। তুমি জীবনের পজিটিভ সাইডটা নিচ্ছ না কেন, তার কারণ তোমার অক্ষমতা। ভাবে যা করা যায়, কাজে তা করা যায় না। ধরতে গেলে শক্তি চাই, ছাড়তে গেলে শক্তির প্রয়োজন হয় না। দুর্বলের আলগা হাত থেকে তো সবই খুড়ে যায়। সেইটাকেই ত্যাগ বলা হোক। উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ।'

'ভোগের একটা ব্যাকরণ আছে। সিঁড়ি আছে। ধাপ আছে। ত্যাগের কোনও ব্যাকরণ নেই। ত্যাগ করতে গেলে কি ভীষণ শক্তির প্রয়োজন, আপনার ধারণা নেই। ছেঁড়া, তালি মারা একটা জামা গা থেকে খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিতে হলেও মন টেনে ধরে। ভোগ বসে আছে মনের ভিতরে, কাঠকয়লার আগুন জ্বেলে। অহরহ ফুঁ মেরে চলেছে বিষয়ের ব্লোয়ার। আরো চাই, আরো চাই, সদাসর্বদা এই সংকীর্তন চলেছে। এই যা পেলুম পরমুহূর্তেই তাতে আর মন ভরে না, অন্য কিছু চাই। চাওয়া, পাওয়া-না পাওয়া, পুড়ে যাওয়া

ছাই। এ এস এইচ। এ এস...এস।'

'আমার কি মনে হয় জানো, ধর্ম, ধার্মিকতা, আধ্যাত্মিকতা, আদর্শ, সংযম, ত্যাগ, বৈরাগ্য, সবই হল দুর্বলের বলিষ্ঠতা। এক ধরনের আত্মতৃপ্তি। তুমি বাংলার এম, এ, তোমার দ্বারা তো আর কিছু করা সম্ভব নয়। স্কুল মাস্টারি জোটানোও শক্ত। তুমি এখন সন্ন্যাসীও হয়ে যেতে পারো। আবার কেউ যদি তোমাকে বলে আমার অসুন্দরী মেয়েটিকে বিয়ে করো, তোমাকে আমি আমার কোম্পানির বিরাট একজন একজিকিউটিভ করে দোবো, তাহলেই তোমার মতিগতি বদলে যাবে। বাঙ্গালোরে সাজানো অফিসে গিয়ে বসবে। সাজানো কোয়ার্টার। লাল গাড়ি। স্যুট, টাই, পার্টি, ড্রিংকস। সোসাইটি। কলগার্ল'স।'

শঙ্কর বললে, ঠিক হচ্ছে না। গতানুগতিক হয়ে যাচ্ছে। দার্শনিক তর্ক-বিতর্কে না গিয়ে, একপাশে বসে নিরাসক্ত হয়ে দেখুন, আমি কি করি। কি ভাবে আমি ফুটে উঠি। ভালো, ক্ষমতাশালী লেখকরা পাকামো না করে জীবনকে অনুসরণ করেন। জীবন সৃষ্টি করেন স্বয়ং ঈশ্বর। এক এক জীবন এক এক রকম। জন্মানো মাত্রই জীবন-ঘড়ির টিকটিক শুরু হয়ে গেল। সব মানুষেরই ভেতর একটি ঘড়ি আছে। সেই ঘড়ি ঠিক করে একজন মানুষ মুহূর্তে মুহূর্তে কেমন থাকবে, তার শরীর, তার মানসিক অবস্থা, তার অনুভূতি, তার কর্মতৎপরতা। রোজ সূর্য উঠছে, সূর্য অস্ত যাচ্ছে। জোয়ার আসছে নদীতে ভাঁটা পড়ছে। বিভিন্ন গতিতে গ্রহ ঘুরছে সূর্যের চারপাশে। কোনও ব্যতিক্রম নেই। সূর্যের গতি, সমুদ্রের জোয়ার ভাঁটার সঙ্গে জীবনের অনেক কিছুর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ। ভূমিকম্পের সাইক্‌ল আছে, ঋতুচক্র আছে, আবহাওয়ার পরিবর্তনের একটা সাইক্‌ল আছে। মানুষের মন, মগজ, ভালো লাগা, না লাগা, কাজ করার ইচ্ছা, অনিচ্ছা সবই এই ঘড়ির নিয়ন্ত্রণে। যদি পারেন ডক্টর হেরম্যান সোবোদার, দি পিরিয়াডস অফ হিউম্যান লাইফ বইটা পড়ে নেবেন। মানুষ যা ভাবে তাই করে, যা ভাবে না, তা করে না, করলেও জোর

করে করে। আর এই ভাবনাটা নিয়ন্ত্রণ করবে তার জন্মকালীন ঘড়ি।'

আমার চরিত্রের হাতে মার খেয়ে আমি থেবড়ে বসে পড়লুম॥

শঙ্কর যে জায়গাটায় শোয়, তার মাথার কাছে একটা কুলুঙ্গি। সেইখানে একটা টেবিল ঘড়ি। মরচে ধরা। তবে অ্যালার্মের শব্দটা ভারি সাঙ্ঘাতিক। সেই শব্দে পুরো বাড়ি জেগে ওঠে। শঙ্করের একটা হিসেব আছে। অ্যালার্মটা যখন বাজে তখন উনুনটা ধরে আসে। শঙ্কর চৌকি থেকে নেমে, ঘুম চোখে সোজা এগিয়ে যায় বাইরে, যেখানে উনুনটা অল্প অল্প ধোঁয়া ছাড়ছে। উনুনটাকে সোজা তুলে এনে রান্নাঘরে বসিয়ে দেয়। একটু দেরি করলেই তার অধৈর্য মা তুলে আনবেন। মা বাতে ক্রমশ বেঁকে আসছেন। কোমরে স্পণ্ডিলোসিস। শঙ্কর মাকে দেবীর মতো শ্রদ্ধা করে, আর বোনকে ভালবাসে ফুলের মতো। সমস্ত কায়িক পরিশ্রম থেকে দূরে রাখতে চায়। শঙ্করের মানসিকতা হল সংসারের সমস্ত ঝড়ঝাপ্টা তার ওপর দিয়েই যাক। অনাহার, অসুখ, অপমান, যা কিছু অশুভ সব বহে যাক তার ওপর দিয়ে, বাকি সকলে ওরই মধ্যে একটু আড়ালে একটু সুখে থাকুক। দুঃখটাকে শঙ্কর ভীষণ ভালবাসে। কষ্টে মানুষ পবিত্র হয়, চরিত্রবান হয়। প্রাচুর্যে মানুষ চরিত্রহীন হয়। জীবন একঘেয়ে হয়ে যায়। শঙ্কর নিজের কাজ নিজেই করে নিতে ভালবাসে। গরম, জ্বলন্ত উনুনটাকে রান্নাঘরে পাচার করে দিয়ে, শঙ্কর বিছানা তুলবে। বোন শ্যামলী তাকে সাহায্য করতে চাইলেও শঙ্কর সাহায্য নেবে না। ছেলেবেলায় তার আদর্শবাদী শিক্ষক তার মনে একটি মন্ত্র লিখে দিয়ে গেছেন চিরতরে, সেল্‌ফ্ হেল্‌প ইজ বেস্ট হেল্‌প। বিছানা তোলার পর শঙ্কর মুখ ধোবে।

উঠান। কল। জল পড়ছে সরু সুতোর মতো। উঠানটা শ্যাওলা ধরাই হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু পরিষ্কার। ঝকঝকে পরিষ্কার। এর জন্যে সমস্ত কৃতিত্বই শঙ্করের পাওনা। শঙ্করের মা একবার পা হড়কে পড়ে গিয়েছিলেন টিনের বালতির ওপর। ঈশ্বরে অসীম কৃপা। কোমরটা ভাঙেনি। সামনের একটা দাঁত খুলে পড়ে গিয়েছিল।

দাঁতটা একটু নড়বড়েই ছিল। সেই দিন থেকে শঙ্করের কাজ হয়েছে, পাথর ঘষে উঠান পরিষ্কার। বাঙালির মজা হল, নিজেরা ভালো কিছু করবে না। অন্যে কেউ কিছু করলে হাসাহাসি হবে। এই উঠান পরিষ্কার নিয়ে নানা কথা শঙ্করের কানে আসে। বেকার ছেলে অফুরন্ত সময় কি আর করবে। একটা কিছু তো করতে হবে! এ কথাও কানে এসেছে,শরীরটা পুরুষের হলেও মন আর স্বভাবটা মেয়ে মানুষের। উনুনে কয়লা দিচ্ছে, দুপুরে গুল দিচ্ছে। কলতলায় চাল ধুচ্ছে। শঙ্কর মনে মনে ভাবে—মুখ দিয়েছেন যিনি,বাত দিয়েছেন তিনি।

কলতলায় যাবার সময় শঙ্কর খড়ম পরে। চিৎপুর থেকে খুঁজে খুঁজে এক জোড়া খড়ম কিনে এনেছে। পায়ের তলাটা নোঙরা হয়ে গেলে তার বিশ্রী লাগে। খড়মের খটাস্ খটাস্ শব্দে সকলকে সচকিত করে শঙ্কর কলতলায় গিয়ে দাঁড়াল। শঙ্কর গামছার বদলে ব্যবহার করে একটুকরো সাদা কাপড়। গামছা জিনিসটাকে সে অপছন্দ করে। তোয়ালে বড়লোকের এবং অস্বাস্থ্যকর। শঙ্কর এক মিটার মার্কিন কিনে এনে নিজেই মেশিন চালিয়ে ধার দুটো সেলাই করে নেয়। তার সেই শিক্ষাগুরু বলতেন, লিভ ইন স্টাইল। বাঁচাটা যেন রুচিসম্মত হয়। অঢেল খরচ না করেও রুচিসম্মত বাঁচা যায়।

বাঙালির জীবন হল, জল আর কল। কলতলা খালি যাবার উপায় নেই। কেউ না কেউ থাকবেই। শঙ্কর খড়ম পায়ে কলতলায় গিয়ে দাঁতে বুরুশ ঘষতে লাগল। আর সেই সময় দ্বিতীয় উনুনটি তুলতে এল আরতি। তীব্র চেহারা। যেমন রঙ, তেমনি ধারালো চোখমুখ। চোখ দুটো যেন ছুরি দিয়ে ছোলা। খুব নাম করা ভাস্কর কেটেছেন। পটলচেরা। মণি দুটো জ্বলজ্বল করছে। শঙ্করের কলতলায় আসা আর আরতির উনুন তুলতে আসা রোজই এক সময় হয়। এই নিয়ে তৃতীয় পরিবারটিতে নানা আলাপ আলোচনা। আরতিদের উনুনটা আকারে বেশ বড়। এক একবারে সের পাঁচেক কয়লা ধরে। আগুনও হয় তেমনি গনগনে। আরতি একহারা, লম্বা।

শঙ্কর রোজই দেখে, আরতি নানাভাবে চেষ্টা করছে উনুনটাকে কায়দা করার। পারছে না। তখন শঙ্কর এগিয়ে গিয়ে বলে, 'দেখি সরুন।' তারপর উনুনটাকে অক্লেশে তুলে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দেয় তাদের রান্নাঘরে। এক মুহূর্ত না দাঁড়িয়ে ফিরে আসে কলতলায়। রোজই আরতি কিছু বলতে চায়। বলা আর হয় না, কারণ শঙ্কর এক মুহূর্ত দাঁড়ায় না। কোনও দিকে তাকায় না। তার মুখে ব্রাশ। গায়ের ওপর সাদা মার্কিনের টুকরো। আরতির জীবনের ঘোরালো একটা ইতিহাস আছে। কে বলেছে বাঙালি ইতিহাস বিমুখ। পারিবারিক ইতিহাস কারোর অজানা থাকে না। কোনও ভাবেই চেপে রাখার উপায় নেই। কোথা দিয়ে ঠিক বেরোবেই বেরোবে। আরতির বাবার আর্থিক অবস্থা একসময় খুবই ভাল ছিল। মধ্য কলকাতায় সুন্দর একটা বাড়ি ছিল। বাড়ির পেছনে কল ছিল, ফুলগাছ ছিল, দোলনা ছিল। একটা গোমড়ামুখো ভকসহল গাড়ি ছিল। আরতিকে দেখলেই বোঝা যায়, আরতির মা খুব সুন্দরী ছিলেন। বিদুষী মহিলা, একটু বিলিতি ভাবাপন্ন। আরতির বাবার বিশাল এক ব্যবসা ছিল। তুই পুরুষের ব্যবসা। পিতামহ ফেঁদেছিলেন, পিতা বাড়িয়েছিলেন। আরতির বাবা আধুনিক করেছিলেন। কারবারটা ছিল এনামেলিং-এর। এনামেলের হাজাররকম জিনিসপত্র তৈরি হত। রপ্তানি হত বিদেশে। বিশাল কারখানা ছিল ওপারে। গঙ্গার ওই কূলে। রপ্তানির সূত্রে আরতির বাবা বহুবার বিদেশে গেছেন। বিবাহ করেছিলেন এক অতি সম্পন্ন স্টিভেডারের সুন্দরী মেয়েকে। মেয়েটি ইংলিশ মিডিয়ামে লেখাপড়া করে গ্র্যাজুয়েট হয়েছিল। শিক্ষিতা, সুন্দরী মেয়ে অনেকটা মৌচাকের মতো। সব সময়ই সেই চাকে মৌমাছি বিড়বিড় করে। আরতির রাসায়নিক পিতা জীবন আর জগৎকে কর্মযোগীর দৃষ্টিতে নিয়েছিলেন। খাটবেন, খুটবেন, অর্থ উপার্জন করবেন, কিছু মানুষের কর্মসংস্থান করবেন। দিনের শেষে ফিরে আসবেন সুখী গৃহকোণে। সেই গৃহকোণ অবাঞ্ছিত উপদ্রবে আর সুখী রইল না। তিনি ভেবেছিলেন বাঙালি মেয়ে এক

স্বামীতেই সন্তুষ্ট থাকবে। তা আর হল কই। বাড়ি, গাড়ি, বিত্ত, আদর্শবাদী স্বামী, স্বাভাবিক এইসব পাওনার ঊর্ধ্বে একটু হিং-এর গন্ধ। একটু পাপ। একটু বিশ্বাসঘাতকতা। একটু লুকোচুরির আকর্ষণ কাবো কারো কাছে অনেক বেশি। থ্রম্বোসিস শুধু মানুষের হয় না, ভাগ্যেরও হয়। আরতিব যখন তিন-চার বছর বয়েস, আবতির মা গৃহত্যাগ করলেন এক তরুণ পাঞ্জাবী-শিল্পপতির সঙ্গে। দিল্লিতে তাঁর বিশাল একসপোর্ট ইম্পোর্টের ব্যবসা। কে জানে ভদ্রমহিলা এখন কেমন আছেন। যৌবন কি ধরা আছে দেহে। থ্রম্বোসিসের প্রথম আক্রমণ। আরতির বাবা করুণাকেতন প্রথম ধাক্কাটা কাটালেন। এলো দ্বিতীয় আঘাত। কারখানায় শুরু হল ধর্মঘট। ভাঙচুব, খুনোখুনি। হল লকআউট। কারখানাব ভেতরে জঙ্গল তৈরি হযে গেল। যন্ত্রে মরচে ধরে গেল। করোগেটের চাল খুলে খুলে পড়ে গেল। ঝড়ে চিমনি তুমড়ে গেল। পেছনের পাঁচিল ভেঙে মালপত্র চুরি হয়ে গেল। করুণাকেতন বেধড়ক ধোলাই খেয়ে হাসপাতালে পড়ে রইলেন তিনমাস। এদিকে এনামেলের জায়গায় এসে গেল, স্টেনলেস স্টিল, প্ল্যাস্টিক,হিট বেজিসটেন্ট গ্লাস। পুরো ব্যবসা চৌপাট হয়ে গেল প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর মতো। বাড়ি গেল, লন গেল, দোলনা গেল, টেনিস কোর্ট গেল। এইবার তিন নম্বর স্ট্রোক। ভাগ্য আর দেহ দুটোই সেই আঘাতে টাইসনেব ঘুসি খাওয়া বক্সারের মতো লুটিয়ে পড়ল রিং-এ। এক থেকে দশ গুণে গেলেন রেফারি। করুণাকেতন উঠতে পারলেন না। মায়ের দেনা শোধ করছে আরতি। মাসের বোজগার সাতশো টাকা। ব্যাঙ্কে ফিকসড ডিপোজিটের ইন্টারেস্ট। আবতির দিকে অনেকেরই নজর আছে। সেই সর্বনাশ আর পৌষ মাসের গল্প। মা যার চরিত্রহীনা, সেই মেয়ে কদিন আর ঠিক থাকতে পারে। তিমির বাচ্চা, তিমিই হবে। অনেকেই দাঁতে দাঁত মিশমিশ কবে বলে, আঃ, একবার বাগে পেলে হয়। পৃথিবীতে বেশ কিছু মানুষ আছে, যাদের দিবাবাত্র এক চিন্তা, কখন একটা মেয়েকে ক্যাঁক করে ধরবো। সামনে দিয়ে কোনও মেয়ে

চলে গেলে ভাবে এই যাঃ, চলে গেল। চোখে শিকারী বেড়ালের ঘুটঘুটে দৃষ্টি। এদিকে তাকাচ্ছে, ওদিকে তাকাচ্ছে। বন্ধুর বাড়িতে গেছে, বন্ধুর স্ত্রী চা দিতে এসেছে। সেন্টার টেবিলে চা রাখার জন্যে নিচু হয়েছে, অমনি, বাপ করে উঠল। বন্ধু জিজ্ঞেস করল, কি হল ভাই সন্তু, চা পড়ল গায়ে?' বন্ধুর স্ত্রী জানে কি হয়েছে। তাড়াতাড়ি সোজা হয়ে বুকে আঁচল টেনে দিল। আর মুহূর্তমাত্র দাঁড়াল না। চলে গেল ভেতরে। চলে যাবার পর স্বামীকে জিজ্ঞেস করল, 'জিনিসটা তোমার কোথাকার আমদানি। চোখে আবার খাবো দৃষ্টি। অসভ্য।'

না, এইবার তৃতীয় উনুনটাকে এশট্যবলিশ করা যাক। রোগা, পাতলা, অ্যানিমিক এক মহিলা, চেহারা দেখে বয়েস বোঝার উপায় নেই। কুড়িও হতে পারে চল্লিশও হতে পারে। ঢালাই উনুন, কয়লাটয়লা পড়ে বিশ, ত্রিশ কেজি ওজন হয়েছে। অতি কষ্টে হাঁপাতে হাঁপাতে উনুনটাকে ভেতরে নিয়ে গেল। পরক্ষণেই, বাইরের রকে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে একপাশে বসে পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভেতর থেকে দামড়াপানা একটা লোক বেরিয়ে এসে, আকাটের মতো বললে, 'কি, আজ চা-টা হবে? চাঁটা না খেলে তোমার দেখি গতর আর নড়েই না। যে পুজোর যা নৈবেদ্য। বাবু এখানে বসে হাওয়া খাচ্ছেন। ওদিকে আমার দোকান লাটে উঠুক।'

শঙ্কর এই দৃশ্য রোজই দেখে। দেখে, একটা পেটমোটা যমদূতের মতো লোক, অসুস্থ, ক্ষীণজীবী এক মহিলাকে ক্রীতদাসীর মতো ব্যবহার করছে। কে বলেছে, দেশ স্বাধীন হয়েছে, মানুষ স্বাধীন হয়েছে, শিক্ষা, সংস্কৃতির প্রসার হিন্দুসভ্যতা এক সুপ্রাচীন সভ্যতা। বিশ্বের গৌরব। দামড়া লোকটা কাটা কাপড়ের ব্যবসা করে। হাতিবাগানে স্টল আছে। অনেক রাতে বাড়ি ফেরে নেশা করে। রোজই বৌটাকে ঘরে খিল দিয়ে পেটায়। অন্যেরা প্রতিবাদ করেছিল, ভদ্রলোকের পাড়ায় এ কি ছোটলোকমি। রোজ রাতে

চিৎকার, চেঁচামেচি। দামড়া এখন পলিসি পাল্টেছে। বউয়ের মুখে গামছা পুরে পেটায়। আবার রোজ সকালে টেরিকটনের পাঞ্জাবি, চুস্ত পাজামা পরে, মশলা চিবোতে চিবোতে ব্যবসায় যায়। তখন বোঝাই দায়, লোকটা ইতর না লোকটা ভদ্রলোক। তখন সে রতনবাবু। দুটো পয়সার মুখ দেখেছে। রতনবাবু আবার পার্টি করেন। বলা যায় না, দেশের যা অবস্থা হচ্ছে, এই মালই হয়তো মন্ত্রী হয়ে বসবেন। হয়তো শিক্ষামন্ত্রী হবেন।

শঙ্কর ব্রহ্মদৈত্যের মতো খড়ম খটখটিয়ে ঘরে গিয়ে ঢোকে তার সেই ছোট ঘরে চারখানা থান ইট আছে। সেই ইট চারটে সরিয়ে প্রাণ ভরে ডন মারে। পঞ্চাশটার কম নয়। শখানেক বৈঠক। জানলার গরাদ ধরে ঝুলে থাকে বেশ কিছুক্ষণ। ব্যায়াম হয়ে যাবার পর, পুরো দু মুঠো ছোলা খায়। চারটে বাতাসা দিয়ে। তারপর এক লোটা জল। এরপর সে একটা ব্যাগ বগলে বাজারে যায়। শঙ্কর বেশ গুছিয়ে বাজার করতে পারে। সাত টাকা হল তার বাজেট। মাসে দুশো দশ টাকা। মাছ, মাংস, ডিম খাওয়ার পয়সা নেই। এক প্যাকেট দুধ আসে। দু'বার চা হয়। সকালে একবার, বিকেলে একবার। একটু বেড়াল খায়। যেটুকু বাঁচে, সেইটুকু সে জোর করে মাকে খাইয়ে দেয়। শঙ্করের বাবার, প্যাকেটের দুধ খাওয়ায় ভীষণ আপত্তি। সংসারের খরচ শঙ্করই কন্ট্রোল করে। মাসে সাতশো টাকার এক পয়সা বেশি খরচ করলে চলবে না। বরং কিছু বাঁচলে ভাল হয়। তিনশো টাকার মতো বাড়ি ভাড়া। শঙ্করদের অবস্থাও এক সময় বেশ ভাল ছিল। বাবা হঠাৎ বসে যাওয়ায় সংসারটা দমে গেছে। শঙ্কর ভাবে, তা যাকগে। চিরকাল মানুষের সমান যায় না। জন্মেছি, জলে পড়েছি। সাঁতার কাটতেই হবে। স্রোতের অনুকূলে, স্রোতের বিপরীতে। যখন. যেমন। হাত পা সর্বক্ষণ ছুঁড়তেই হবে। তা না হলেই ভুস। অতল তলে। শঙ্কর যে ভাবে বেঁচে আছে, সেই বাঁচাটাই তার ভীষণ ভালো লাগে। সকালে ছোলার বদলে, ডিম আর টোস্ট হলে তার খুব খারাপ লাগবে। ডাল, ভাত আর যে কোনও

একটা তরকারির বেশি অন্য কিছু হলে সে খেতেই পারবে না।

শঙ্কর যেমন শঙ্করদের সংসার চালায়, আরতি সেইরকম চালায় আরতিদের সংসার। শঙ্কর ছেলে, আরতি মেয়ে। শঙ্কর আর আরতি প্রায় একই সময় রাস্তায় নামল। দুজনেরই হাতে ব্যাগ। আরতির ব্যাগটা সুন্দর, শঙ্করের ব্যাগটা সাদামাটা। আরতির রুচিটা একটু অন্যরকম। তাদের ঘরদোর ওরই মধ্যে বেশ সাজানো গোছানো। প্রতি মাসে কোনও একটা জায়গা থেকে বেশ কিছু টাকা আসে। আমি জানি, কোথা থেকে আসে। আরতির বাবার কিছু টাকা ব্যাঙ্কে ফিকসড করা আছে। সেই সুদে কোনওরকমে চলে যায়। দুজনের সংসার। ঝামেলা তেমন নেই। আরতি জীবনের সুদিন দেখেছে, তাই এই দুর্দিনে সে একটু বিষণ্ণ। রাস্তায় বেরোলে তার বিষণ্ণতা বেশি বোঝা যায়। উদাস দৃষ্টিতে চারপাশে তাকাতে তাকাতে চলে। যেন সে হেঁটে চলেছে জগৎ সংসারের বাইরে দিয়ে।

শঙ্কর রাস্তায় বেরোলেই পাড়ার কয়েকটা বাচ্চা তাকে ঘিরে ধরে। ওরা সব শঙ্করের বন্ধু। বাচ্চাগুলোকে শঙ্কর ভীষণ ভালবাসে। তাদের সঙ্গে এমনভাবে কথা বলে যেন সমবয়সী! খেলার কথা, পড়ার কথা, খাওয়ার কথা। বাড়িতে কিছু তৈরি হলে শঙ্করের জন্যে নিয়ে আসে পকেটে করে। ঠোঙায় করে। এই বাচ্চাদের সঙ্গে শঙ্কর মাঝে মাঝে চড়ুইভাতি করে। সে বেশ মজা। কেউ নিয়ে এল আলু। কেউ নিয়ে এল ময়দা। কেউ তেল। কেউ বনস্পতি। শঙ্করের সমান ভাগ থাকে। একটা কেরসিন কুকার আছে। অপুদের বাড়ির ছাদে, জমে গেল বনভোজন। শঙ্কর রাঁধে, বাচ্চারা জোগাড়ে। কখনও কখনও শ্যামলা এসে যোগ দেয়, সেদিন রান্নাটা বেশ খোলতাই হয়। শালপাতা। লুচি আলুরদম, শুকনো, শুকনো। শঙ্কর সন্ধ্যেবেলা বাচ্চাগুলোকে এক জায়গায় করে পড়তে বসায়। তখন তার ভূমিকা শিক্ষকের। এদের কারোরই অবস্থা তেমন ভালো নয়। শঙ্করের একটাই ভয়, পৃথিবীর প্রতিযোগিতায় ওরা যেন বড়-লোকদের কাছে হেরে না যায়। যত সুযোগ ওরাই তো গ্রাস করে

নিচ্ছে। ভালো বাড়ি। ভালো স্কুল, ভালো খাওয়া, ভালো পরা। রাস্তা দিয়ে যখন গাড়ি হাঁকিয়ে যায়, তখন ধরাকে সরা জ্ঞান করে। এদের সঙ্গে ট্রেনের এক কামরায় ভ্রমণ করা যায় না। সিনেমা, থিয়েটারে বসা যায় না। রেস্তোরাঁয় ঢোকা যায় না। এদের অর্থের উৎস হল ব্যবসার দুনম্বরী পয়সা। চাকরি হলে বাঁ হাতের কামাই। পয়সার জোরে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যারিস্টার, বিলেত, সুন্দরী স্ত্রী। পৃথিবীর সমস্ত ঝোল এরা নিজেদের কোলেই টানছে। একটা বাচ্চা একবার খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। তার চিকিৎসার জন্যে শঙ্কর সাহায্য সংগ্রহে বেরিয়েছিল। পাড়ার সকলেই সামর্থ্য অনুসারে যে যা পারলেন, দিলেন। পাড়ার বড়লোক শিল্পপতি মানিক ব্রহ্ম বললেন, 'চাঁদা তুলে তুমি কজনের চিকিৎসা করাবে? সারা দেশটাই তো অসুস্থ। এই সব দায়িত্ব হল স্টেটের।' ভুরু কুঁচকে ভদ্রলোক বলেছিলেন, 'আমাদের দেশের সমস্যাটা কি বলো তো, এই রকেটের যুগে আমরা এখনও পড়ে আছি পল্লীমঙ্গলের আইডিয়া নিয়ে। ও সব বাজে কাজ ছেড়ে দেশটাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করো। কিছু মরবে, কিছু বাঁচবে। যাদের বাঁচার অধিকার নেই, তাদের মরতে দাও। একটা গাছে যত ফল ধরে সবই কি আর বাঁচে থাকে? কিছু পাখিতে ফেলে দেয় ঠুকরে। কিছু পড়ে যায় ঝড়ে। কিছুতে পোকা লেগে যায়। জীবজগতের এই হল নিয়ম। তুমি কি করবে, আমিই বা কি করব।' মানিক ব্রহ্ম আচ্ছা করে উপদেশ পাম্প করে শঙ্করকে ছেড়ে দিলেন। এদেশে তিনটে জিনিস খুব সহজে পাওয়া যায়, বিনা পয়সায়। কলের জল, উপদেশ আর গণ ধোলাই।

অপুটাকে দেখতে ভারি সুন্দর; কিন্তু ভাগ্যটা ভীষণ অসুন্দর। তিনবছর বয়েসে বাবাকে হারিয়েছে। ভদ্রলোক হাওড়ার এক ঢালাই কারখানায় কাজ করতেন। সেইখানে এক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান। স্ত্রী, ছেলে, বৃদ্ধা মা আর সাবেককালের একটা একতলা বাড়ি রেখে গেছেন। অপুর মা যে কি-ভাবে সংসার চালান, শঙ্কর তা জানে না।

সবাই আশা করেছিলেন, অপুর মা বাড়ি-বাড়ি বাসন মেজে বেড়াবে। অন্তত পাড়ার লোক একজন সুন্দরী, যুবতী ঝি পাবে। সে গুড়ে বালি। অপুর মা আজ সাত-সাতটা বছর ঠিকই চালিয়ে যাচ্ছেন, ভদ্রঘরের বউদেব যেমন চালানো উচিত। এই নিয়েও গবেষণাব শেষ নেই। একটা সিদ্ধান্তে এসে এখন সবাই বেশ সন্তুষ্ট, অপুব মা লুকিয়ে দেহ-ব্যবসা করে। আরে ছিঃ ছিঃ! এই ছি ছি শব্দটা বলতে পারায় সকলেবই বেশ কোষ্ঠ-সাফ।

অপু শঙ্করেব হাতে একটা কাগজের মোড়ক দিয়ে বললে, 'মা তিলেব নাড়ু কবেছিল, তোমার জন্যে নিয়ে এলুম। জিনিষটা কেমন হয়েছে, খেয়ে বলো তো। তুমি তো তিলের নাড়ু ভালবাসো।'

'ভালবাসি মানে। তিলেব নাড়ু আমার জীবন। গোলাপের গন্ধ আছে?'

'না গো, গোলাপ আমবা পাবো কোথায়! শোনো না, আমি অনেক অনেক বড হয়ে, যখন তোমার মতো বড হযে যাবো, তখন তো আমি চাকরি করবো, তখন তোমাকে আমি গোলাপ তিলের নাড়ু খাওযাবো, প্যাঁডা খাওয়াবো।'

'বড় হলেই কি আর চাকরি পাওয়া যায় রে অপু। এই তো দেখ না, আমি বড় হয়ে বসে আছি।'

'তুমি চাকবি পাওনি তো, সে বেশ হয়েছে। কেন বলো তো, তুমি চাকরি পেলে, রোজ নটার সময় বেরিয়ে যাবে, আর রাত নটায় ফিরে আসবে, তাহলে? আমাদের কি হবে, বলো। তুমি শঙ্করদা চাকবি কোবো না। তুমি একটা দোকান দাও। আমার মা বলছিল, আমাদের রাস্তার দিকের ঘরের দেয়ালটা ভাঙলে সুন্দর একটা দোকান ঘর হবে। সেখানে, একটা দর্জির দোকান করলে কেমন হয়। তা মা বললেন, আমি, তো ছাঁটকাট বেশ ভালই জানি, সঙ্গে একজন পুরুষ মানুষ থাকলে করা যেত। তুমি আজ মায়ের সঙ্গে কথা বলো না শঙ্করদা। আমার তাহলে টেরিফিক আনন্দ হয়।'

'তোর না অপু কোনও বুদ্ধি নেই, একেবারে গবেট মেয়ে

যাচ্ছিস। অঙ্কে তুই রসগোল্লা পাবি। দোকান করতে গেলে টাকা চাই। অ্যাতো, অ্যাতো টাকা। সেই টাকাটা কোথা থেকে আসবে পাঁঠা।'

'টাকা?' কথা হচ্ছিল রকে বসে। অপু গালে হাত রাখল। শঙ্কর অপুর সেই ভঙ্গিটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মোড়ক খুলে একটা তিলের নাড়ু মুখে ফেলল। বেশ মুচমুচে। পাকটা বেশ ভালই হয়েছে।

অপু হঠাৎ যেন আশার আলো পেল। গাল থেকে হাত সরিয়ে শঙ্করের হাঁটুতে একটা চাপড় মেরে বললে, 'নো প্রবলেম। আমরা এ বছর, মা দুর্গার পুজো করবো। বারোয়ারি।'

'হচ্ছে দোকানের কথা, তুই চলে গেলি দুর্গাপুজোয়। তুই কেমন করে ফার্স্ট সেকেণ্ড হোস। আয়, তোর মাথাটা ওপেন করে দেখি।'

'শোনো না, আমার প্ল্যানটা। তারপর তুমি আমাকে গাধা বলো গাধা, পাঁঠা বলো পাঁঠা। আমরা ঘুরে ঘুরে, ঘুরে ঘুরে অনেক টাকা চাঁদা তুলবো, তারপর ছোট এতটুকু একটা মূর্তি এনে পুজো করে, বাকি টাকায় দোকান।'

শঙ্কর অপুর মাথায় টাক করে একটা গাঁট্টা মেরে বললে, 'ওরে আমার চাঁছু রে তারপর গণধোলাই। হাতে হাতকড়া। কোমরে দড়ি। কি প্ল্যানই বের করলে।'

'তা হলেও তুমি একবার আমার মায়ের সঙ্গে কথা বলো। জানো তো, তোমাদের বাড়ির ওই রতনবাবু মাকে খুব জপাচ্ছে। লেডিজ টেলারিং করবে। লোকটা একেবারে দু নম্বরী। যখন-তখন আমাদের বাড়িতে ঢুকে পড়ে। কাল রাতে চুল্লু খেয়ে এসেছিল। আমি কিন্তু একদিন পেছন থেকে ঝেড়ে দোবো। লোকটা কাল রাতে আমার মায়ের গায়ে হাত দেবার চেষ্টা করেছিল। শঙ্করদা তুমি আমার মাকে ভালবাসো তো?'

'ভীষণ! যারা সৎপথে থেকে লড়াই করে, আমি, তাদের সকলকেই ভালবাসি।'

'মা-ও তোমাকে ভীষণ ভালবাসে। 'তুমি একটা কিছু করো শঙ্করদা।'

'দাঁড়া, ব্যাপারটা সিরিয়াসলি ভেবে দেখি। আজ দুপুরে তুই আমাকে মিট কর। তারপর দু'জনে মিলে লড়ে যাবো। তুই ভাইরাস কাকে বলে জানিস?'

'না গো।'

'ভাইরাস এমন রোগ জীবাণু, যা কোনও ওষুধে মরে না। এই রতন-টতন হল সেই ভাইরাস।'

'তিলের নাড়ু কেমন খেলে?'

'জমে গেছে।'

'মাকে গিয়ে বলতে হবে। মা তোমাকে ভীষণ খাওয়াতে ভালবাসে। বলে, আমার যদি সেরকম অবস্থা হত, তাহলে তোর শঙ্করদাকে আমি রোজ রোজ নানা রকম করে করে খাওয়াতুম। আমার মা কত কি যে করতে জানে।'

'সে আর কি হবে। বেশি বাজে বাজে খাবি না। পেলেও না। ডাল, ভাত একটা যে-কোনও তরকারি। বাকি সব বোগাস। এই নে, এই দুটো নাড়ু তুই খা।'

'আমি তো খেয়েছি।'

'তবু খা। আমি দিচ্ছি।'

শঙ্কর শিশুমহল ছেড়ে উঠে পড়ল। শঙ্করের কড়া নিয়ম, এইবার সব পড়তে বসবে। সবাই জানে ঠিক মতো লেখাপড়া না করলে শঙ্করদা আর ভালবাসবে না। তা ছাড়া শঙ্করদা ওই বড় বাড়ির ছেলেদের দেখিয়ে বলে দিয়েছে, ওদের হারাতে হবে। লেখাপড়ায়, খেলাধুলোয়, শরীর-স্বাস্থ্যে। ওই যে ছাইরঙের বাড়ির ছেলেরা খুব কেতা মেরে, সাদা প্যান্ট, স্পোর্টস গেঞ্জি পরে ক্রিকেট প্র্যাকটিস করতে বেরোয়। ব্যাট, লেগগার্ড, গ্লাভস, টুপি, ওয়াটার বটল, হটবক্সে লাঞ্চ। শঙ্করদা বলেছে, তোরা কাঠের বল আর দিশি ব্যাটে অনেক বড় খেলোয়াড় হবি। শরীরটাকে আগে ভালো করে পেটা।

লোহা তৈরি কর। লোহা। শঙ্কর যা বলে, এরা তাই শোনে। শুধু শোনে না, প্রত্যেকে ভালোভাবে গড়ে উঠছে।

শঙ্কর যখন রাস্তা দিয়ে হাঁটে তখন মনে হয় রাস্তার দু'ধারে আনন্দ ছড়াতে ছড়াতে চলেছে। এ পাড়ার প্রতিটি মানুষ তাকে ভীষণ ভালবাসে, কারণ শঙ্কর সকলের। শঙ্করের সেই শিক্ষকমহাশয় অনেক দিন আগে শঙ্করকে বলেছিলেন, 'দেখ শঙ্কর, ভাগ্য কাকে বলে জানো?'

'গ্রহ।'

'না গ্রহ যাদের ভাগ্য, তারা হল দুর্বল, স্বার্থপর। একটা জিনিস চিরকালের জন্যে জেনে রাখো, সবলের জন্যে, গ্রহ, নক্ষত্র, ঠিকুজী, কোষ্ঠী, পাথর নয়। তুমি আর তোমার পৃথিবী। মাঝখানে কেউ নেই, মাথার ওপরেও কেউ নেই। এই পৃথিবীর সঙ্গে যে-সম্পর্ক তুমি গড়ে তুলবে সেইটাই তোমার ভাগ্য। পৃথিবীর সঙ্গে যদি ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারো, তাহলেই তুমি সফল মানুষ। কৃতী পুরুষ। পৃথিবী মানে শুধু মানুষ নয়, জীবজন্তু, প্রকৃতি। আর পৃথিবীর সঙ্গে যদি তোমার ঘৃণার সম্পর্ক হয়, তাহলে অন্যভাবে তুমি যত সফলই হও, পৃথিবী তোমার কাছে আর স্বর্গ থাকবে না, হয়ে যাবে নরক।' শিক্ষকমহাশয় বারে বারে ইংরেজি করে বলেছিলেন, 'ইউ অ্যাণ্ড ইওর ওয়ার্ল্ড।'

শঙ্কর সেই শিক্ষাটিই মনে প্রাণে গ্রহণ করেছে। প্রথম প্রথম অভ্যাস করতে হয়েছে, এখন স্বভাবে এসে গেছে। এখন সে চেষ্টা না করেও ভালবাসতে পারে। কোনও কারণ ছাড়াই আনন্দে থাকতে পারে, আনন্দ বিলোতে পারে। শঙ্কর যে বাজারে বাজার করে, সেই বাজারের বাইরে চাষীরা এসে বসে। তারা কিছু শস্তায় আনাজপাতি দেয়। শঙ্কর তাই অকারণে ভেতরের বাজারে ঢোকে না। ভেতরে সব পয়সাঅলা লোকের তাণ্ডব। কেউ অসময়ের কপি কিনছে, কেউ কিনছে টোম্যাটো। কারোর আবার বিট-গাজর না হলে চলে না। বইয়ে পড়েছে, বিট-গাজরে হেলথ ভালো হয়, আর যায়

কোথায়। পুলিসের আস্তাবলে ঘোড়া গাজর খাচ্ছে, এদিকে গুপী-বাবুও খাবাব টেবিলে বসে গাজরের স্যুপ খাচ্ছেন। মুখ চোখ দেখলে করুণা হয়, মনে হয় সতীদাহর বদলে পতিদাহ হচ্ছে।

শঙ্কর দূর থেকে দেখলে,ফুলের দোকানের সামনে বেশ যেন একটা গণ্ডগোল মতো হচ্ছে। ছোটখাটো একটা ভিড় জমে গেছে। শঙ্কর দোকানটার পাশ দিয়ে যেতে যেতে দেখলে,গোলমালটা হচ্ছে আরতির সঙ্গে। ফুলঅলার গলাই বেশি কানে আসছে। শঙ্কর প্রথমে ভেবেছিল নাক গলাবে না। মেয়েদের ব্যাপারে সে মাথা ঘামাতে চায় না। কখন কি হয়ে যায়। মন নয়তো মতিভ্রম। কোনভাবে একবার খপ্পরে পড়ে গেলেই সংসার। তখন কামিনী-কাঞ্চনের দাসত্ব। মেয়েরা মানুষের সত্তা হরণ করে। নাকে দড়ি বেঁধে সংসারের ঘানিতে জুড়ে দেয়। এত ভেবেও শঙ্কব না এগিয়ে পারলো না। পাশ থেকে সে আরতিব মুখটা দেখতে পেল। ধাবালো, অভিজাত একটি মুখ। টিকলো নাক। ঘাড় পর্যন্ত লম্বা রেশমের মতো চুল। আরতিকে বাইরের আলোয আরও ফর্সা দেখায়। টান টান পাতলা দেহত্বকের ভেতর থেকে রক্তের আভা বেরিয়ে আসে। সাধারণ বাঙালী মেয়ের চেয়ে দীর্ঘকায়। শরীরেব কোথাও অপ্রয়োজনীয় মেদ নেই। শঙ্করের মনে হচ্ছিল, সে যেন শাড়ি পরা একটা জিপসী মেয়েক পাশ থেকে দেখছে। মুখে ফুটে আছে অসহায একটা বিরক্তিব ভাব। আরতি কথা বলছে খুবই নীচু স্বরে, ফুলঅলা চিৎকার করছে গাঁক গাঁক করে। আরতির বিব্রত আব বিরক্ত মুখ দেখে শঙ্করের খুব করুণা হল। এই শ্রেণীর মানুষেব কাছ থেকে শঙ্কর সবে থাকতেই চায়। অবস্থা থেকে পতন হলেও, আরতিরা ক্যাপিটালিস্ট মনোবৃত্তির মানুষ। বাবা ছিলেন শিল্পপতি। বহু লোক কাজ করত তাঁর কারখানায়। তিনি ডাণ্ডা ঘোরাতেন। দুর্ব্যবহার করতেন। ন্যায্য দাবি থেকে তাদের বঞ্চিত করতেন। আজ জার্মানি, কাল প্যারিস করে বেড়াতেন। বিলিতি সুরার সঙ্গে মোলায়েম চিকেন খেতেন। শ্রমিকের রক্ত শোষণ করতেন।

এই অবধি শুনে চিত্রপরিচালক আর প্রযোজক দুজনেই চিৎকার করে উঠলেন, 'মারো ফ্ল্যাশব্যাক। লোকটাকে তুলুন বিছানা থেকে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটা চরিত্র বিছানায় শুয়ে থাকলে চলে। স্রেফ শুয়ে শুয়ে আর কোঁত পেড়ে পয়সা নিয়ে যাবে। তা ছাড়া স্টোরির এই জায়গায় একটা অবৈধ প্রণয়ের স্কোপ আছে।'

কথা বলছিলেন প্রযোজক। দশটা কোল্ড স্টোরেজের মালিক। চারটে পশ্চিম বাংলায়। সে পা থেকে মাথা পর্যন্ত হরিপাল আর তারকেশ্বরের আলু। আলুর একেবারে এক্সপার্ট। কোন আলু কখন পচবে, একবার উঁকি মেরেই বলতে পারেন। এম পি-তে দুটো কোল্ড স্টোর। সেখানে শুধু ডিম। ইউ পি-তে আপেল। একসময় উচ্চ রক্ত চাপের চিকিৎসা ছিল, শিরা কেটে খানিক রক্ত বের করে দেওয়া। প্রযোজক ভদ্রলোকের তহবিলে কিছু কালো রক্ত জমেছে। সেই রক্ত কিঞ্চিৎ ঝরাবেন। নায়ক-নায়িকাদের সঙ্গে একটু গা ঘষাঘষি করবেন। প্রতিষ্ঠিতরা তেমন পাত্তা দেবেন না। নতুন মুখ আনবেন।

ঠিক তাই। প্রযোজক পরিচালককে বললেন, 'আরতির ক্যারেক-টারটা বেশ ফুটছে। আপনি কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিন—আমাদের নতুন বাংলা ছবির জন্যে নতুন নায়িকা চাই। যাঁদের চেহারা জিপসীর মতো। কোমর সরু, পেছন ভারি, বুক উঁচু, ছবি সহ আবেদন করুন। ফুল সাইজ। সামনে থেকে, পেছন থেকে, পাশ থেকে।'

পরিচালক বললেন, 'তারপর আমি প্যাঁদানি খেয়ে মরি। দমদম সেন্ট্রাল জেলে গিয়ে লপসি আর ধোলাই দুটোই একসঙ্গে খাই। নতুন মুখ আজকাল আর পেপার পাবলিসিটি দিয়ে হয় না। দিনকাল বিগড়ে গেছে। ট্যালেন্ট সার্চ করতে হয়। বড় বড় হোটেল রেস্তোরাঁয় রোজ দুপুর থেকে বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত গিয়ে বসে থাকতে হয়। বিশ তিরিশ হাজার খরচ হয় হোক, কিন্তু উঠে আসবে একটা নতুন মুখ।'

আপনার মশাই টাকা ওড়াবার ধান্দা।'

'এই লাইনটাই যে ওড়াবার আর ওড়বার।'

পরিচালক আমাকে বললেন, 'আমার একটা সাজেসান আছে। আপনি ফুলের দোকানের বদলে ওটাকে তরমুজের দোকান করে দিন। আমার একটু সুবিধে হয়।'

'কি আশ্চর্য! আপনার সুবিধে! আরতির আজ একটা ফুলের মালার প্রয়োজন যে। তার বাবার আজ জন্মদিন। তাছাড়া, এটা কি তরমুজের সময়। আম চলে গেছে। আপেল ঢুকছে। আঙুর আসছে। কমলালেবু পাকছে।'

'আপনাকে সে নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। আই সে তরমুজ, অ্যাণ্ড দেয়ার শুড বি তরমুজ। লাল, লাল অজস্র গোল গোল তরমুজ ডাঁই হয়ে আছে। তরমুজ হল সেকস-সিম্বল। আমি আমার ক্যামেরার অ্যাঙ্গল থেকে ভাবছি। একটা সাইড থেকে ধরছি। কিছু তরমুজ ফোকাসে, কিছু অফ ফোকাসে। কাঁধকাটা গেঞ্জিপরা তরমুজঅলার চকচকে পুরুষ্ট কাঁধ, বাহু, ঘাড়, গলায় একটা লকেট। চোখ দুটো কমলাভোগের মতো। ক্যামেরা ধীরে ধীরে প্যান করছে। তরমুজঅলার ছাপকা ছাপকা নীল লুঙ্গি। তার আড়ালে স্তম্ভের মতো উরু। ক্যামেরা ঘুরছে, সামনে দাঁড়িপাল্লা, তরমুজ, তরমুজ, আরতির বুক। ক্যামেরা আরতির গা চেটে চেটে উঠছে ওপর দিকে। ঘাড, গলা, চিবুক, মুখ, চুল, ব্যাকলাইটে সিল্কের কেশরের মতো চুল বেয়ে আবার নিচে, পিঠ, নিতম্ব, ক্যামেরা ব্যাক করছে, আরতির পুরো শরীর, সামনে তরমুজ, তার ওপাশে তরমুজঅলার অশ্লীল মুখ। ক্যামেরা টপে। আরতির ব্রেস্টলাইন, বুকের কাছে মোমপালিশ করা লাল একটা তরমুজ, ফর্সা টুকটুকে হাতে ধরে আছে। শর্ট ডিজলভ। এক গেলাস লাল তরমুজের সরবত নিয়ে আরতি এগিয়ে আসছে, শঙ্কর বসে আছে সোফায়। আরতি স্লো-মোশানে আসছে। তার ম্যাকসি আর চুল বাতাসে উড়ছে। সে স্লো-মোশানে এসে তুলোর মেয়ের মতো শঙ্করের সোফার

হাতলে শরীরে শরীর ঠেকিয়ে বসে পড়ল। বাঁ হাত শঙ্করের কাঁধে, ডান হাতে পাতলা গেলাস। গেলাসে লাল তরমুজের সরবত। এই-খানে একটা গানের স্কোপ। গজল টাইপের গান, ফুরোবার আগে পান করে নাও থ্যাঁতলানো যৌবন। আর কদিনই বা পৃথিবীতে আছি, বলো না আলাদিন। আলাদিন। আলাদিন। এইখানে ইকো লাগাবো। একেবারে ফেটে যাবে। এদিকে গান আর নাচ চলেছে। ওদিক থেকে মরা মাছের মতো তাকিয়ে আছে বৃদ্ধ দুটো চোখ। ইনভ্যালিড বুড়ো বাপ দেখছে মেয়ের রঙ্গ। শরীর পড়ে গেছে। কথা সরে না মুখে, কিন্তু স্মৃতি আর চেতনা দুটোই কাজ করছে। ফের এগেন ফ্ল্যাশ-ব্যাক। আবতির মা বাতাসে উড়তে উড়তে আসছে, ব্যালে ড্যানসারের পোশাক পরে। বাংলা ছবিতে ব্যালে আমিই প্রথম চালু করবো। আবতির ডবল রোল। একবার মা, একবার মেয়ে। মেয়েকে দেখে বাপের মেয়ের মায়ের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। এক ঢিলে দু'পাখি। কায়দা করে বুড়োর ললিতা কমপ্লেক্স দেখানো হয়ে গেল।'

প্রযোজক বললেন, 'আর শঙ্করকে দিয়ে অত ভাবিয়েছেন কেন? সিনেমায় ভাবনার কোনও স্কোপ নেই, কেবল অ্যাকসান, অ্যাকসান।'

'সে তো আপনার দিক। আমাকে তো গল্পটা আগে ছাপাতে হবে। সাহিত্য একটু জীবনদর্শন, চিন্তাভাবনা, এসব চায়। প্রুস্ত-এর নাম শুনেছেন। সেই ভদ্রলোকের লেখায় শুধুই ভাবনা। ভাবতে ভাবতেই শেষ। আগে আমাকে সাহিত্যের কথা ভাবতে হবে। আপনারা তো প্রথমে আমাকে পাঁচশোটি টাকা ছুঁইয়ে সরে পড়বেন, তারপর তো আপনাদের আর টিকির দেখা পাওয়া যাবে না।'

'ওটা আমাদের লাইনের একটা রীতি। লেখককে বলি দিয়ে আমাদের শুভমহরত হয়। প্রাচীনকালে কি প্রথা ছিল জানেন, ব্রিজ তৈরির সময় নরবলি দেওয়া হত। একটাকে মেরে আরও হাজারটা মৃত্যু ঠেকানো। ব্রিজও বড় কাজ, ফিল্মও বড় কাজ। বিশ,

তিরিশ লাখ টাকা গলে যাবে।'

'আপনার বাজেট চল্লিশ, পঞ্চাশ লাখ, আর লেখক বেচারার পাওনা পাঁচশো। কি বিচার মাইরি আপনাদের।'

'না, পাঁচশো নয়। আপনাদেরও তো পয়সার খাঁকতি কম নয়। কচলাকচলি, ধস্তাধস্তি করে সেই হাজার পাঁচেকেই গিয়ে ঠেকে। সেকালে সাহিত্যিক তো আর নেই। তাঁরা সাহিত্যটাই বুঝতেন। আপনারা সাহিত্য বোঝেন না, কেবল বোঝেন টাকা আর পুরস্কার। শেম! শেম! সাহিত্য-সেবা করুন। সরস্বতীর সেবা। লক্ষ্মীর সেবা নয়। তিন পাতা কি লিখলেন তার ঠিক নেই, আধবোতল হুইস্কি উড়ে গেল।'

প্রযোজক বললেন, 'আমি আর একটা জায়গায় সাংঘাতিক রকমের সেকস, রেপ ভায়োলেন্স দেখতে পাচ্ছি। কড়া মশলা। অপুর মা। মধ্যবয়সী এক মহিলা। আট কি ন বছর বয়সের একটা ছেলের মা। সাবেককালের একতলা একটা বাড়ি। গাঁথনির ইট সব ফাঁক ফাঁক হয়ে গেছে। সেই ইটের ফাঁকে আটকে ঝুলছে সাপের খোলস। তার মানে ভিটেতে বাস্তু সাপ বসে আছে ঘাপটি মেরে। সাপের খোলস দেখলেই গা সিরসির করে। সেই সিরসিরে ভাবটা এসট্যাবলিশ করতে হবে। খোলোস দুলছে বাতাসে, বাতাসে দুলছে শাড়ি। প্রতীকী ব্যাপার। সাপ এখনও আছে। ছোবল এখনও মারতে পারে। সিনেমার প্রতীকী শট হল, আপনাদের সাহিত্যের ভাবনা। মহিলার ভরাট শরীর, যাকে বলে রাইপ যৌবন। সুন্দরী তো বটেই। ডিসপেপটিক নয়। স্বামীর মৃত্যুর পর অনেক বছর হয়ে গেছে। স্মৃতি ফেডআউট করেছে। শরীর শরীরের ধর্ম পালন করতে চায়। মন আনচান করে। সব শাসন ছিঁড়ে বেরিয়ে যেতে ইচ্ছে করে। যত রাত বাড়ে শ্বাস ততই দীর্ঘ হয়। জ্বর নয়, জ্বর-জ্বর লাগে।'

'এ তো আপনার সাহিত্য।'

'সাহিত্য তো বটেই। এক সময় আমিও লিখতুম মশাই।

আলুতে আমাকে শেষ করে দিয়েছে।'

'সাহিত্য পর্দায় আসবে কি করে। পেছনে থেকে কমেণ্ট্রি হবে। ভারি গলায় কোনও শ্রেষ্ঠ আবৃত্তিকার পাঠ করে যাবেন, এঁর বগলে থার্মোমিটার দিলে জ্বর উঠবে না, কিন্তু সূর্য পশ্চিম আকাশে নেমে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই এঁর জ্বর লাগে। আড়মোড়া ভাঙতে ইচ্ছে করে।'

প্রযোজক চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। মুখে হুইস্কির গন্ধ হালকা হয়ে এসেছে। বুকের কাছে বিলিতি গন্ধ ছুঁড়েছিলেন, সেই গন্ধে শরীরের গন্ধ মিলে, মানুষের জীবনের বেঁচে থাকার বিচিত্র এক সুবাস তৈরি হয়েছে।

'কি হল মশাই?'

'আপনাকে এখুনি পাঁচশো টাকা অ্যাডভান্স করে যাবো; এ স্টোরি আমার চাই।'

'আপনার এই আকস্মিক উত্তেজনার কারণ?'

'উঃ, অসাধারণ একটা কথা আপনি বললেন, আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।'

'কি কথা মশাই?'

'ওই যে বগল আর থার্মোমিটার। সুন্দরী এক মহিলা নিজের বগলে নিজে থার্মোমিটার গুঁজছেন। ভাবতে পারেন দৃশ্যটা? আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছে। দৃশ্যটা সামনে করিয়ে এখুনি দেখতে ইচ্ছে করছে।'

প্রযোজক উত্তেজনায় চেয়ার মিস করে ধুপ মেঝেতে বসে পড়লেন। সেই অবস্থায় থেকেই বললেন, 'ডিরেক্টার, এই রোলটা কে নেবে? কাকে দেওয়া যায়। সেই যে সেই মহিলা, কি যেন একটা ছবিতে করলেন, বিবাহিতা হয়েও ফটোগ্রাফারের সঙ্গে লড়ালড়ি।'

'বুঝেছি। ভালোই হবে।'

'তুমি তা হলে বুক করে ফেল! যত টাকা লাগে। যদ্দিন আমার আলু আছে, তদ্দিন আমার টাকার অভাব নেই। কোথায় পাওয়া

যাবে তাকে?'

'বোম্বাই।'

'তুমি আজই ফ্লাই করো।'

পরিচালক বললেন, 'ফুলটাকে তাহলে তরমুজ করে দিন। আমি একটা বিউটি অ্যাণ্ড দি বিস্ট ধরনের মারাত্মক শট নিয়ে বাংলার কেন, সারা বিশ্বের চিত্রজগৎকে স্তম্ভিত করে দেবো।'

প্রযোজক বললেন, 'তরমুজের বদলে আলু করলে হয় না। আমার খরচ তা হলে কমে।'

'ধুর মশাই আলুর কোনও গ্ল্যামার নেই। কালার ফিল্মে আলু যায় না। তরমুজ হল ইতালির জিনিস। ইতালি মানে সোফিয়া লোরেন, ব্রিজিৎবার্দো। ডিরেক্টার আমি না আপনি?'

'আমি প্রযোজনা না করলে তোমার পরিচালনা হয় কি করে?'

'আর আমি ভাল ছবি না করে দিলে, আপনার বিদেশ যাওয়া হয় কি করে? আলু করে তো আর ফরেন যাওয়া যায় না।' প্রযোজক একটু দমে গেলেন। ব্রীফকেস খুলে ময়লা ময়লা পাঁচটা একশো টাকার নোট বের করে আমার হাতে দিতে দিতে বললেন, 'আলুর আড়তে নোট এর চেয়ে পরিষ্কার হয় না। আপনি বগল আর থার্মোমিটারটা ঠিক করুন। আর একটা জায়গা আপনি কামাল করে দিয়েছেন, সেটা হল সেলাই মেশিন। উঃ আপনার মাথা মশাই। মাথা না বলে হেড বলাই ভালো।'

'সেলাই মেসিন পেলেন কোথায়?'

'কি আশ্চর্য, এই আপনার হেডের প্রশংসা করলুম। অপুর মা টেলারিং করবে। শঙ্কর জয়েন করবে, এইরকমই তো ঠিক হল।'

'গল্প সেদিকে যায় কিনা দেখি। এখনও তো ফুলের দোকানেই আটকে আছে।'

'যায় মানে। যাওয়াতেই হবে। অপুর মা জোরে জোরে সেলাই-কল চালাচ্ছে, শঙ্কর ঠিক উল্টো দিকে মেঝেতে বসে আছে। এইখান থেকেই স্টোরিতে শঙ্করের পতনের শুরু। ছুটো গোল গোল

পা আর ভারি ভারি উরু মেশিনের তালে তালে নাচছে। শঙ্করের মনও নাচছে। নামছে, নিচের দিকে নামছে। ক্যাবারে ড্যান্সারের পোশাকের মতো আদর্শ খুলে খুলে পড়ে যাচ্ছে।

পরিচালক বললেন, 'বাকিটা অন্যের হাতে ছেড়ে দিন। এই শটেও আমি আমার ফ্র্যাকচার করে দেবো। মেশিনের চাকা ঘুরছে, চাকা ঘুরছে। ক্যামেরা ক্লোজ ফোকাসে ঘুরন্ত চাকা ধরছে। চাকা ধীরে ধীরে থেমে আসছে, আর সেই চাকার ভেতর দিয়ে টাইট-ফোকাসে, দু জোড়া পা, মেঝেতে, জড়াজড়ি, ঘষাঘষি, মহিলার কলাগাছের কাণ্ডের মতো পায়ের অনেকটা ওপরে শাড়ির কালো ফিতে পাড়। একটা হাত, মাথার পাশে মাথা, আর একটা হাত, একটা বড় কাঁচি, ক্লোজআপে।'

প্রযোজক বললেন, 'এইবার আমার হাতে ছেড়ে দাও। কাঁচিটাকে আরও ক্লোজ-আপে নিয়ে এসো। উল্টো দিকের দরজাটা অল্প ফাঁক হল। একটি কিশোরের মুখ। বড় বড় চোখ। চোখ ভরা বিস্ময়। ছেলেটি আততায়ীর মতো ঢুকছে। পায়ে পায়ে এগোচ্ছে কাঁচিটার দিকে। নিচু হয়ে তুলে নিল কাঁচিটা। তারপর ক্যামেরার ভিশানে একটা তালগোল পাকানো দৃশ্য। একটা হাত উঠল। একটা কাঁচি। ভীষণ একটা চিৎকার। সেলাই মেশিনটা উল্টে পড়ে গেল। শঙ্কর উপুড় হয়ে আছে। তলায় অপুর মা। শঙ্করের পিঠে বড় কাঁচিটার আধখানা ঢুকে আছে। আর রক্ত-ভেজা সেই পিঠে মুখ গুঁজে অপু হাপুস কাঁদছে আর বলছে, শঙ্করদা, শঙ্করদা তুমি আমার শঙ্করদা। আর শঙ্কর ওই অবস্থায় ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বলছে, অপু, তুই ঠিক করেছিস, তুই ঠিক করেছিস,তোকে কেউ বুঝবে না, তুই পালা। তুই সোজা পালিয়ে যা। তা না হলে তোকে পুলিসে ধরবে। অপু উঠে দাঁড়াল। ভয়ে ভয়ে তাকাল এদিকে ওদিকে। তারপর হঠাৎ দু'-হাতে দরজাটা ঠেলে খুলে পাগলের মতো ছুটতে লাগল,আর চিৎকার, 'আমি খুন করেছি, আমি খুন করেছি।'

পরিচালক বললেন, 'এইবার আমার হাতে ছেড়ে দিন। লম্বা,

সোজা, রাস্তা ধরে অপু ছুটছে, ছুটতে ছুটতে অপু হোঁচট খেয়ে ছিটকে পড়ে গেল। বিশাল একটা লরি আসছিল স্পিডে। চাকার সামনে অপুর মাথা। ব্রেক। স্ত্রী-ই-ই-চ শব্দ। অপুর ঘুম ভেঙে গেল। বিছানা। পাশে হাত রাখল। মা নেই। অপু বোঝার চেষ্টা করছে।'

প্রযোজক বললেন, 'আগের শটটাকে স্বপ্ন করে দিলে?'

'তা কি করবো। মাঝ রাস্তায় হিরোকে মেরে দেবো! তাহলে বই তো মার খেয়ে ভূত হয়ে যাবে। চুপ করে শুনুন। এইবার রিয়েল খেল্। অপুর কানে একটা শব্দ আসছে। যেন কোথাও ছুটো সাপ ফোঁস ফোঁস করছে। অপু বিছানায় উঠে বসল। ঘর অন্ধকার। একটা মাত্র জানলা খোলা। সেই খোলা জানলায় রাতের আকাশ দূরে কোথাও একটা কুকুর কাঁদছে। অপু বসে আছে চুপ করে। সেই ফোঁস ফোঁস শব্দটা এখনও কানে আসছে। ক্যামেরা একবার বাড়িটার বাইরে ঘুরে গেল। জনপদ নিদ্রিত। অনেক উঁচু একটা বাড়ির সর্বোচ্চ তলের একটি ঘরে, জোরালো আলো। একটা মানুষের সিল্যুয়েট। অপুদের বাড়ির ইটের ফাঁক থেকে বেরিয়ে আসা হিলহিলে সেই সাপের খোলসটা বাতাসে দুলছে। পাশের বাড়ির টিভির অ্যান্টেনায় প্রায় টাটকা একটা ঘুড়ি বাতাসে বনবন ঘুরছে। তার পাশেই একটা বাড়ির কবজা ভাঙা জানলার পাল্লা যেন ভূতে দোলাচ্ছে। ক্যামেরা আবার ফিরে এল ঘরে। অপু বসে আছে মশারির ভেতরে। সেই ফোঁস ফোঁস শব্দ। অপু মশারি তুলে নেমে এল। অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। খোলার চেষ্টা করল। বাইরে থেকে বন্ধ। তিন-চারবার টানাটানি করল। অপু কাঁদো কাঁদো গলায় ডাকল—মা, ওমা, তুমি কোথায়। অপু বন্ধ দরজার সামনে বসে পড়ল। ফোঁস ফোঁস শব্দটা থেমে গেল। ক্যামেরা চলে এল ঘরের বাইরে। অন্ধকার প্যাসেজে দানবের মতো একটা লোক অপুর মাকে ভাল্লুকের মতো জড়িয়ে ধরে আছে। অপুর মা প্রাণপণ চেষ্টা করছে নিজেকে ছাড়াবার, ছাড়ুন, ছাড়ুন, ছেলেটা উঠে পড়েছে। লোকটা জড়ানো গলায়

বলছে শালাকে একদিন গলা টিপে শেষ করে দোবো শয়তানের বাচ্চা। তোমাকে আমি এখন ছাড়তে পারবো না। অপুর মা লোক-টাকে ঠেলে সরাবার চেষ্টা করছে। লোকটা বলছে, তোমাকে আমি দোকান করার জন্যে, পঁচিশ হাজার টাকা দেবো অমনি অমনি। তুমিও মাল ছাড়ো আমিও মাল ছাড়ি। অপুর মা লোকটাকে কামড়ে দিল। লোকটা নেশার ঘোরে অপুর মায়ের গলাটা দু হাতে চেপে ধরল। অপুর মা একটা শব্দ করল। অপু দরজা ঝাঁকাচ্ছে। চিৎকার করছে। লোকটা অন্ধকারে রাস্তায় নামলো। টলতে টলতে এঁকে-বেঁকে চলেছে। তিনটে বাড়ি পরে, রকে একটা লোক শুয়েছিল। সে মাথার চাদর সরিয়ে লোকটাকে দেখে নিল। কানে আসছে কিশো-রের গলার মা, মা ডাক। দরজা ঝাঁকাবার শব্দ। শব্দের পর শব্দ। দরজা, জানালা খোলার শব্দ। সারা পাড়া জেগে উঠেছে। অপুদের বাড়ির সামনে ভিড় জমে গেছে। তিনটি সাহসী ছেলে ভেতরে ঢুকছে। ক্যামেরা ফলো করছে। তিন ধাপ সিঁড়ি। দালান। এক-জনের পায়ে লেগে একটা বোতল ছিটকে চলে গেল। সে বলে উঠল শালা। সে আরও দু ধাপ এগিয়ে কিসে লেগে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। পড়েই সে চিৎকার করতে লাগলো, মার্ডার, মার্ডার। যে দু'জন পেছনে ছিল, তারা ওরে ব্বাবারে বলে ছুটে বাইরে চলে গেল। অপু সমানে মা, মা করে যাচ্ছে। কাট। পুলিসের জিপ আসছে। শেষ রাত। তিন-চারজন লাফিয়ে নেমে পড়ল। টর্চের আলো। সকলে ঢুকে গেল ভেতরে। ক্যামেরা অনুসরণ করছে। টর্চের আলো গিয়ে পড়ল অপুর মায়ের মুখে। মহিলাকে গলা টিপে হত্যা করা হয়েছে। কিছু দূরে গড়াগড়ি যাচ্ছে একটা হুইস্কির বোতল। পড়ে আছে একটা গ্যাস-লাইটার। দালানের আলোটা জ্বালা হয়েছে। সঙ্গে আছে টর্চের আলো। পুলিস আঁতিপাতি করে জায়গাটা খুঁজছে। পড়ে আছে সিগারেটের টুকরো। একটা মিনি-বাসের টিকিট। দলাপাকানো একটা রুমাল। নতুন, বড় একটা মোম-বাতি। আরতির মায়ের হাতের মুঠোয় কয়েক গাছা চুল। পুলিসের

অফিসার লাশ তুললেন না। খড়ির গুঁড়ো ছড়িয়ে গোটা জায়গাটা বেষ্টন করে দিলেন। একজন পাহারায় রইল। অফিসার জনসাধারণের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'এ বাড়িতে আর কে আছে?'

'এর একটা ছোট ছেলে আছে স্যার, ওই ঘরে পুরে বাইরে থেকে চাবি বন্ধ করে দিয়েছে।' 'চাবি নয় স্যার ছিটকিনি।' ক্যামেরা সঙ্গে সঙ্গে দরজায়। সাবেক কালের দরজা। বাঘের মুখ কোঁদা। রঙ চটে গেলেও বোঝাই যায় ভীষণ পোক্ত। একটা জায়গায় খড়ি দিয়ে বড়-বড় করে লেখা, অপু। দরজা খোলা হল। ক্যামেরা পুলিসের দু'পায়ের ফাঁক দিয়ে ঘরের ভেতরে নজর করল। জানালা দিয়ে ভোরের আলো আসছে। ফুলের মতো একটি কিশোর মেঝেতে বসে আছে হামাগুড়ি দিয়ে। কাট। পুলিস বেরিয়ে আসছে। তাদের মাঝখানে অপু। বাইরে অনেক লোক। তার মাঝে একটা দাড়ি-গোঁফঅলা শক্ত-সমর্থ পাগল। সে হা হা করে হাসছে, তালি বাজাচ্ছে, আর বলছে, 'কে করেছে খুনখারাবি, সবই আমি বলতে পারি, কে করেছে খুনখারাবি।' সবাই তাকে দূর দূর করছে—'বেরো ব্যাটা পাগলা পাগলা। পাগল ছাড়া বাংলা ছবি জমে না। মনে আছে সেই পাগল ধীরাজ ভট্টাচার্য, আই ক্যান ফোরটেল ইওর ফিউচার। কি অসাধারণ অভিনয়, এক পাগলেই পয়সা উসুল।'

আমি সেই ময়লা ময়লা একশো টাকার নোট পাঁচটা বের করে প্রযোজক ভদ্রলোকের হাতে দিয়ে বললুম, 'এই নিন আপনারা দুজনে হাফাহাফি ভাগ করে নিন, স্টোরি তো আপনারাই করে ফেলেছেন।'

'আহা! রাগ করছেন কেন। একেই বলে তোমার আছে সুর, আর আমার আছে ভাষা। আপনাদের ওরিজিন্যাল স্টোরির তো শেষ পর্যন্ত ওই অবস্থাই হয়, মলাট আর খুদে খুদে অক্ষরে পর্দার গায়ে একটা নাম, এই তো শেষ পরিণতি। ফিল্ম সাহিত্য নয়, ফিল্ম হল এগ্‌জিস্টি। পয়সা ঢালেগা, পয়সা তোলেগা। আপনাদের সাহিত্য হল অক্ষর সাজাবেন আর নাম কিনবেন। নগদ যা পাচ্ছেন পকেটে ভরে ফেলুন, কাজে লেগে যান। বাকিটা আমরা ফ্ল্যাশব্যাক করে

ফ্রিমে লেন্স ভরে নামিয়ে দোবো। লিখতে বসার সময় স্লাইট একটু চুকু করে নেবেন, দেখবেন অটোমেটিক মাল বেরিয়ে আসবে। পেটে ডিজেল না ঢুকলে লেখার অটোমোবিল চলবে কিসে!'

দুই মাল বেরিয়ে গেলেন। আমি পয়মাল বসে রইলুম হাঁ করে। স্কুলের দোকানের সামনে আমার শঙ্কর আর আরতি দাঁড়িয়ে। আমার স্বর্গীয় কিশোর অপু এইবার স্কুলে যাবে। তার মা পরিষ্কার সাদা হাফ প্যাণ্টের ভেতর গুঁজে দিচ্ছে সাদা জামা। অমন দেবীর মতো মায়ের দিকে আমি আর ভালোভাবে তাকাতে পারছি না। বিশ্রী একটা পাপবোধ আসছে। সত্যিই কি শঙ্করকে তিনি দেহের ফাঁদে ফেলবেন? রতন হালদারের পক্ষে অবশ্য সবই সম্ভব। পৃথিবীতে বেশ কিছু গাছ আর প্রাণী আছে, যারা অকারণে গরল ছড়ায়। অনেক বিকল্প খাদ্য থাকা সত্ত্বেও মানুষ নিরীহ মুরগীর পালক ছাড়ায় চড়চড় করে। নিজের সুন্দরী স্ত্রী ফেলে বেশ্যালয়ে গিয়ে ধুমসো মেয়ে-ছেলের গোদা পায়ের লাথি খায় পয়সা খরচ করে। এই যেমন কারণাসক্ত, ব্যবসাদার দুজন, আমার চোখ দুটো ঘোলা করে দিয়ে গেল। যেন আমার জণ্ডিস হয়ে গেল! শঙ্কর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবাশ্রিত। পরোপকারী। প্রকৃতিপ্রেমী। বিশ্বপ্রেমী। যার জীবনের আদর্শই হল নিঃস্বার্থ সেবা, তাকে কেমন করে আমি অপুর মায়ের পায়ের সামনে বসাই। লোক দুটো কি সাংঘাতিক বদ! কি বিশ্রী রুচি-বিকৃতি নিয়ে সমাজে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মেশিনের সামনে আমার শঙ্করের মতো ছেলেকে বসতে হবে। সে বসে বসে দেখবে দুটো পৃথুল পা নাচছে। আমিও এক মহাপাপী। যে বই আমার পড়া উচিত নয়, সাইকোলজি,সেই বই পড়ে জেনেছি,সেলাই মেশিনে পা দিয়ে চালাতে চালাতে,মেয়েদের এক ধরনের দৈহিক উত্তেজনা হয়, তখন তাদের পা আরও দ্রুত চলতে থাকে। যে কারণে মেয়েদের পা -মেশিন চালানো বারণ। শঙ্করকে বসে বসে এই দৃশ্য দেখতে হবে। দেখতে দেখতে উত্তেজিত হতে হবে। তার উচ্চ মানস-ভূমি থেকে ধপাস করে পড়ে যেতে হবে। এক ভদ্রমহিলা খোলা গায়ে বগলে

থার্মোমিটার লাগাচ্ছেন। সেখানেও সেক্স। এরপর কোনও মহিলা দাঁতে টুথব্রাশ ঘষছেন, সেখানে সেক্স। দেখার কি দৃষ্টি! আমার নিজেরই ভয় লাগছে এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে।

শঙ্কর এগিয়ে গেল ভিড় সরিয়ে। ঝগড়া শুনতে অথবা মিটমাট করতে নয়, ভিড় জমেছে আরতিকে দেখতে। এমন রূপসী মেয়ে এ তল্লাটে নেই। এই লোকগুলোকেই বা আমি কি বলবো। সব বয়েসেরই মানুষ আছে। আরতিকে চোখ দিয়ে গিলছে। কেউ চোখ দিয়ে কোমর ধরেছে, কেউ ধরেছে নিতম্ব, কেউ চেষ্টা করছে বুকটাকে ভাল করে দেখার, যেন কার্ডিয়োলজিস্ট। কেউ তার ফুরফুরে, ঘাড় পর্যন্ত লম্বা, বাদামি চুলের দিক থেকে নজর সরাতে পারছে না।

ফুলঅলা শঙ্করের পরিচিত। খুবই পরিচিত। একসময় দুজনে জুভিনাইল ক্লাবে ফুটবল খেলত। শঙ্করকে সামনে দেখে ছেলেটা একটু থতমত খেয়ে গেল। শঙ্কর বললে, 'এ-সব কি হচ্ছে মানিক? জানিস, তুই কার সঙ্গে কথা বলছিস?'

'মাইরি বলছি শঙ্করদা আমি দু'টাকা ফেরত দিয়েছি। মাইরি বলছি।'

আরতি তেজালো গলায় বললে, 'দু-টাকা ফেরত দিলে, টাকা দুটো আমার হাতেই থাকত। টাকা দুটো নিশ্চয় আমি গিলে ফেলিনি! সব কেনার পর আমার হাতে শেষ একটা পাঁচ টাকার নোট ছিল। মালার দাম তিন টাকা। দুটো টাকা গেল কোথায়।'

শঙ্কর বললে, 'মানিক তোর ভুল হচ্ছে। এইরকম ভুল হতেই পারে। তোমাকে ঠকিয়ে দুটো টাকা নেবার মতো মহিলা ইনি নন।'

'ভুল তো ওনারও হতে পারে।'

'হলে টাকাটা ওঁর হাতেই থাকত; কারণ ওর বুকপকেট নেই।'

কথা বলতে বলতে শঙ্করের নজর চলে গেল ছোট একটা বালতির দিকে। ছোট্ট অ্যালুমিনিয়ামের বালতি। সেই বালতিতে রয়েছে এক গুচ্ছ গোলাপ ফুল। সেই ফুলগুলোর পাশে, জলে একটা কি ভাসছে। শঙ্কর বললে, 'ওটা কি?' তারপর আরতির পাশ দিয়ে হাত বাড়িয়ে

নিজেই তুললে। আধভেজা একটা দু'টাকার নোট।

'মানিক এটা কি? দেখেছিস, কিভাবে ভুল বোঝাবুঝি হয়? টাকাটা এখানে পড়ে গেছে। তোর দেখা উচিত ছিল। তা না করে তুই সমানে গলাবাজি করে যাচ্ছিস।'

মানিক হাত জোড় করে বললে, 'দিদি, আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন।'

'আপনি আমাকে অনেক যা-তা কথা বলেছেন। শঙ্করদা এসে না পড়লে আপনি এই এতগুলো মানুষের সামনে জোচ্চর প্রমাণ করে ছাড়তেন। আমার টাকা আর মানসম্মান দুটোই যেত।'

'এই দেখুন দিদি, আমি কান মলছি। ব্যবসাদার জাতটাই বড্ড…।'

শঙ্কর বললে, 'মানিক, আর না।'

আর একটু হলেই মানিকের মুখ ফসকে একটা গালাগাল বেরিয়ে আসত।

শঙ্কর বললে, 'যান, এবার আপনি সোজা বাড়ি চলে যান।'

আরতির ভেতর সুন্দর একটা ছেলেমানুষী ভাব আছে। যখন হাসে, গালে একটা টোল পড়ে। ভুরুর কাছটা, ঠিক নাকের ওপরের জায়গায় অদ্ভুত একটা ভাঁজ পড়ে। যার কোনও তুলনা হয় না। আরতির এই হাসি দেখলে শঙ্কর অবশ হয়ে পড়ে। তার মনে এক সঙ্গে অনেক দরজা খুলে যায়। অনেক আলো জ্বলে ওঠে। নানা রঙের কাঁচ বসানো জানালায় রোদ পড়লে যে বর্ণসুষমা হয়. তার মনেও সেইরকম একটা রঙ খেলা করে। সুন্দরী কোনও নর্তকী পায়ে ঘুঙুর বেঁধে নাচতে থাকে। ভীষণ একটা টানাপোড়েন চলতে থাকে ভেতরে। এক মন বলে, ছিঃ ছিঃ, আর এক মন বলতে থাকে, এই-টাই তো স্বাভাবিক। শঙ্কর যখন নোট তোলার জন্যে হাত বাড়াচ্ছিল তখন আরতির অনাবৃত কোমরে হাত ছুঁয়ে গিয়েছিল। মসৃণ, ভিজে ভিজে। সারা শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে গিয়েছিল। সেই অনুভূতিটা শঙ্কর কিছুতেই ভুলতে পারছে না। তার কেঁদে ফেলতে ইচ্ছে করছে।

আরতি সেই অদ্ভুত হাসি হেসে বললে, 'আপনি যাবেন না ?'

'আমার তো সবে শুরু হল।

'আমি যদি আপনার সঙ্গে থাকি, তাহলে রাগ করবেন ?'

'আমাকে কোনও দিন রাগতে দেখেছেন। আপনার কষ্ট হবে।'

'আমাকে তুমি বলতে কি আপনার খুব কষ্ট হবে ?'

শঙ্কর হেসে ফেলল। তার মনে হচ্ছে, নেশা হয়ে গেছে। কিছু আর ভাবতে পারছে না। শীতের সকালে স্নান করে রোদে দাঁড়ালে যে-রকম একটা সুখ-সুখ ভাব হয়, সেইরকম একটা সুখ-বোধ হচ্ছে। শঙ্কর আর আপত্তি করতে পারল না। আরতিকে পাশে নিয়ে চাষীরা যেদিকে বসে সেইদিকে যেতে যেতে বললে, 'চলো তোমাকে শস্তার বাজারটা চিনিয়ে দি। দাম কম, টাটকা জিনিস।'

'আমার না অনেক অনেক বাজার করতে ইচ্ছে করে একসঙ্গে। ব্যাগ ভর্তি, ঝুড়ি ভর্তি বাজার।'

'আমারও করে, তবে আমাব বাজেট সাত টাকা। বেশ ভালই বাবা, বেশি বাজার মানে বেশি বোঝা।'

'আমার বাজেট মাত্র পাঁচ টাকা, তবে আমি একসঙ্গে তিন দিনের বাজার করি।'

'তোমার বেঁচে থাকতে কেমন লাগে, আরতি ?'

'যখন আমাদের অনেক কিছু ছিল, তখন খুব একঘেয়ে লাগত; এখন কিন্তু বেশ উত্তেজনা পাই। এই মনে হচ্ছে, বাবার কি হবে ! বাবার কিছু হলে আমার কি হবে ! আজ গেলে কাল কি হবে, এই ফুরিয়ে গেল কেরোসিন তেল, কে লাইন দেবে। কে যাবে ব্যাঙ্কে ইন্টারেস্ট তুলতে। আপনি বোধহয় জানেন না, আমাদের আবার অনেকদিনের পুরনো একটা মামলা আছে। তার জন্যে প্রায়ই উকিলের বাড়ি ছুটতে হয়। মামলাটা বেশ মজার। আমাদের ছোট্ট একটা বাগানবাড়ি আছে বারাসতে। সেই বাড়ির কেয়ারটেকার ছিলেন বাবার এক বন্ধু। তিনি বাবার এই অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে বাড়িটার দখল ছাড়ছেন না। আমি কেস ঠুকে দিয়েছি।

কেসটা যদি জিততে পারি তাহলে আমাদের কষ্ট অনেকটা কমবে। যেভাবে আছি সে ভাবে থাকা যায় না। তারপর ওই রতন হালদার। এগজিবিসনিস্ট।'

'সে আবার কি?'

'সে আপনাকে আমি মুখে বলতে পারবো না। যেদিন ধরে জুতোপেটা করবো সেদিন বুঝতে পারবে। আচ্ছা আপনি আমাকে দেখলে অমন মুখ ফিরিয়ে নিতেন কেন? কথা বললে হুঁ হাঁ করে পালিয়ে যেতেন?'

'সত্যি কথা বলবো, আমার মধ্যে একটু ভণ্ডামি আছে, পাকামিও বলতে পারো। বেকার মানুষ তো, তাই কাজের না পেয়ে নানারকম স্বপ্ন দেখি। সন্ন্যাসী হব, বিরাট সমাজসেবক হব, বন্যাত্রাণে নৌকো নিয়ে ভেসে পড়বো, দণ্ড-কমণ্ডলু নিয়ে চলে যাবো কৈলাস। এই সব মাথায় ঢোকার ফলে মেয়েদের ভীষণ ভয় পাই। যদি কোনভাবে আটকে যাই। নিজের খাবার যোগাড় নেই, তার ওপর সংসার!'

'মেয়েরা কি পুরুষজীবনের বাধা?'

'সংসারজীবনের নয়, সন্ন্যাসজীবনের বাধা তো বটেই।'

'সন্ন্যাসী কেন হবেন? সংসারে কোনও কাজ নেই? এই যে আপনি একগাদা বাচ্চাকে মানুষ করছেন, সারা পাড়াকে আনন্দে মাতিয়ে রেখেছেন এটা কাজ নয়?'

'কি বলবো বলো? আমার ভাল লাগে। এখন ধরো আমি যদি সেজেগুজে পক্ষীরাজ মার্কা হয়ে প্রেম করি, আমার এই মনটা হারিয়ে যাবে। আর একটা সত্যি কথা বলবো, রাগ করবে না, বলো?'

'নির্ভয়ে বলুন।'

'তোমাকে আমি ভয় পাই। তুমি এত সুন্দরী, আর তোমার এমন সুন্দর ভাব, তোমাকে দেখলেই আমার ভালবাসতে ইচ্ছে করে, ভীষণ ভালবাসতে।'

আরতি শঙ্করের হাতটা মুঠোয় ধরেই ছেড়ে দিল। ছেড়ে দিয়ে

বললে, 'আমিও আপনাকে ভীষণ ভালবাসি আপনার গুণের জন্যে।'

কথায় কথায় বাজার হয়ে গেল। শঙ্কর আজ আর তার সাত টাকার সীমার মধ্যে নিজেকে ধরে রাখতে পারলো না। ছিটকে বেরিয়ে গেল। অনেক দিন পরে বাজারে শোলা-কচু এসেছে। শঙ্করের ভীষণ প্রিয়। ছাঁকা তেলে শোলাকচু ঝুরো করে কেটে ভাজলে ফুলে উঠে যা অসাধারণ স্বাদ হয়।

শঙ্কর বললে, 'তুমি তো একা। তাই ইচ্ছে থাকলেও অনেক কিছু রাঁধতে পারো না। আমার মা আছে বোন আছে। ভীষণ ভালো রাঁধেন আমার মা। তোমাকে আজ আমি দুটো রান্না খাওয়াবো। খাবে তো?'

'নিশ্চয় খাবো। তাহলে আজ আমি বাবার স্যুপটা করবো, আর কিছু করব না। আমার তৈরি স্যুপ খুব খারাপ হয় না। আপনি একটু টেস্ট করবেন?'

'না গো, আমি তো একা কিছু খেতে পারি না। সকলকে দিতে গেলে তুমি কুলোতে পারবে না। আর একদিন হবে।'

দু'জনে বাড়ি ফিরে এসে অবাক! আরতিদের ঘরের সামনে ছোট-খাটো একটা জমায়েত। শঙ্করের মা ঘরের ভেতরে। শ্যামলী বাইরে যাবার জামাকাপড় পরেও বেরোতে পারেনি। আরতিদের ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে। হাতে একটা ভিজে তোয়ালে। শঙ্কর মাকে জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে, মা?'

'ঘরে একটা শব্দ হল। এই তোরা আসার এক মুহূর্ত আগে ছুটে এসে দেখি এই ব্যাপার।'

করুণাকেতন পড়ে আছেন মেঝেতে। চিৎ হয়ে। চোখ দুটো ঊর্ধ্বে স্থির। শ্বাসপ্রশ্বাস পড়ছে কিনা সন্দেহ। আরতি রোজ সকালে সাতটার মধ্যে বাবাকে সাজিয়েগুজিয়ে দেয়। একমাথা পাকা চুল। ভিজে তোয়ালে দিয়ে মুছে, পাউডার ছড়িয়ে, সামনে সিঁথি করে আঁচড়ে দেয়। একদিন অন্তর আরতি নিজেই সুন্দর করে দাড়ি কামিয়ে দেয়। আজ ছিল দাড়ি কামাবার দিন। ফর্সা দুটো গাল

চকচক করছে। করুণাকেতনের ঠোঁটের পাশ দিয়ে জলের মতো একটু কিছু গড়িয়েছে।

শঙ্কর করুণাকেতনের পাশে হাঁটু মুড়ে বসে বুকে কান পাতল। তারপর ডান হাতটা তুলে নিয়ে নাড়ী টিপে ধরল। একসময় হাতটা ধীরে ধীরে নামিয়ে রাখল। মুখ তুলে তাকাল। প্রথমেই চোখে পড়ল আরতির মুখ। অসাধারণ ছটো চোখ। একেই বলে কাজললতা চোখ। ছটো অপরাজিতা ফুলের পাপড়ি। শঙ্কর এমন চোখ কখনও দেখেনি। এমন নাক সে দেখেনি। যেন অ্যালফ্যানসো আমের আঁটি স্টেনসিলকাটার দিয়ে কেটে তৈরি করেছেন ভগবান স্বয়ং।

শঙ্কর হাঁটুভাঙা অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়াল মাথা নিচু করে। ছ হাত জোড় করে নমস্কার করল। বুঝিয়ে দিল, করুণাকেতন চলে গেছেন। সঙ্গে সঙ্গে আরতি শঙ্করের চওড়া বুকে মাথা গুঁজে দিল। শঙ্করের মা এগিয়ে এসে আরতির মাথার পেছনে হাত রেখে অঝোরে কাঁদতে লাগলেন। শঙ্করের একটা হাত আরতির কাঁধে। আর একটা হাত মায়ের পিঠে। তার ছ হাতে ছ' রকমের অনুভূতি।

করুণাকেতনকে ধরে বিছানায় তোলা হল। ভদ্রলোক পড়ে যাবার সময় বিছানার চাদরটা খামচে ধরার চেষ্টা করেছিলেন। খাটের ধারে একটা বেড়া ছিল, ছপাশে ছটো ছিটকিনি দিয়ে আটকানো যায়। সেই বেড়াটা কি করে খুলে গেল কে জানে। আরতি জন্মদিনের মালাটা মৃত্যুদিনের মালা করে বাবার বুকে পেতে দিল। আরতি খুব শক্ত মেয়ে। ভেতরে ভাঙলেও বাইরে ভাঙেনি। তার চেহারা যেমন ধারালো.মন আর চরিত্রও সেইরকম ধারালো। শঙ্করের মা আর বোন যতটা ভেঙেছে আরতি ততটা বিচলিত হয়নি। সে জানে, আজ থেকে সে সম্পূর্ণ একা।

শঙ্কর পথে নেমে এল। তার শিশুবাহিনী স্কুলে। পাশে কেউ না থাকলে শঙ্কর তেমন জোর পায় না। বড় কেউ হলে চলবে না। ছোটরাই তার শক্তি। তাদের সঙ্গে বকবক করতে করতেই সে পথ খুঁজে পায়। শঙ্কর তার পরিচিত ডাক্তারবাবুকে ডেকে নিয়ে এল।

করুণাকেতনকে যে ডাক্তারবাবু দেখতেন, তিনি কয়েক সপ্তাহের জন্যে ফরেনে গেছেন।

করুণাকেতন যখন ঘরে ফেরার জন্যে পথে নামলেন, তখন দিন শেষ হয়ে এসেছে। শঙ্করের শিশুবাহিনী এসে গেছে। মানী লোকের যেভাবে যাওয়া উচিত শঙ্কর ঠিক সেইভাবেই ব্যবস্থা করেছে। ফুলে ফুলে সাজানো পালঙ্ক। শিশুবাহিনীকে সে এখন থেকেই মানুষের যাওয়াটা দেখাতে চায়। যাওয়ার পথ চেনা থাকলে হাঁটতে অসুবিধে হয় না। অপু ফিসফিস করে বললে, 'তুমি যে বলেছিলে বড়লোকের কোনও সাহায্যে লাগবে না, তাহলে ?'

'এরা বড়লোক নয়, মানীলোক, জ্ঞানী, গুণী, বিজ্ঞানী। জিনিসটা বুঝতে শেখ। আর এক মাস পরে তোর গোঁফ বেরোবে গবেট।'

অপুর হাতে খইয়ের ঠোঙা। অপু এই প্রথম শ্মশানে চলেছে। শ্যামল একবার ঘুরে এসেছে। তিন মাস আগে শ্যামলের বাবা আন্ত্রিকে মারা গেছেন। করুণাকেতন চোখে চশমা পরে আরামে শুয়ে আছেন। মানুষের শেষ যাত্রাটা বেশ আরামেই হয়। রোগযন্ত্রণা চলে গেছে। এই মহানিদ্রায় যদি মহাস্বপ্ন থাকে, সে স্বপ্ন আর ভেঙে যাবার ভয় নেই। শঙ্করের ডাকে শঙ্করের সমবয়সী আরও চার-পাঁচজন নেমে এসেছে করুণাকেতনকে কাঁধ দেবার জন্যে। মানুষটির জীবন যখন ধনেধনে ভরপুর ছিল তখন বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনের অভাব ছিল না। ফ্লাশব্যাকে করুণাকেতনের জীবন আমি দেখতে পাচ্ছি। তাঁর ইণ্ডাস্ট্রী, গাড়ি-বাড়ি, ঝাড়লণ্ঠন লাগানো বিশাল খাওয়ার ঘর, খানা-টেবিল। দিন রাত অতিথিঅভ্যাগতের আনাগোনা। সুন্দরী, শিক্ষিতা স্ত্রী। শিফনের শাড়ি। বিলিতি সুগন্ধ। অনেক রঙিন বেলুনের গুচ্ছ। তারপর সব একে একে ফাটতে শুরু করল। ঝুলে রইল নিজের জীবনের সরু একটি সুতো।

প্রায় ছ'ফুট লম্বা শঙ্কর। কোমরে কোঁচায় গাঁট বেঁধে দিশি একটা ধুতি পরেছে একটু উঁচু করে। তার ওপর সাদা ধবধবে একটা গেঞ্জি। চাঁপা ফুলের মতো গায়ের রঙ। এক মাথা রেশমের মতো চুল। ডান

কাঁধে লাল একটা গামছা পাট করা। তার ওপরে খাটের একটা দিক। শঙ্করের পাশে আরতি। সামনে, পেছনে শঙ্করের শিশুবাহিনী। কারোর হাতে একগোছা জ্বলন্ত ধূপ। কেউ ছড়াচ্ছে খই আর পয়সা। শবযাত্রা সুগম্ভীর কবিতার মতো এগিয়ে চলেছে শ্মশানের দিকে। যে শাড়ি পরে আরতি সকালে বাজারে গিয়েছিল, সেই শাড়িটাই পরে আছে। আজ আর দুটি পরিবারেই হাঁড়ি চড়েনি। শঙ্কর আজ আরতিকে মায়ের হাতের ঝিঙে-পোস্ত আর শোলাকচু ভাজা খাওয়াতে চেয়েছিল। ভাগ্যের কি পরিহাস। প্রতিটি মানুষ এক-একটি ঘড়ি। জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই সেই ঘড়ি চলতে থাকে টিকটিক করে। দমে ক'বছরের পাক মারা আছে তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। আরতি পায়ে পায়ে সামনের দিকে এগোলেও, মনে মনে সে চলেছে পেছন দিকে। মাকে তার স্পষ্ট মনে আছে। বিচিত্র এক মহিলা। রূপটাই ছিল। গুণ বলে কিছুই ছিল না। ভীষণ অর্থলোভী উচ্ছৃঙ্খল, দুর্দান্ত এক মহিলা। রূপের গর্বে, বাপের বাড়িব ঐশ্বর্যের গর্বে একেবারে মটমট করত। কতদিন সে দেখেছে, বাবা, গভীর রাতে, একা একটা আর্মচেয়ারে বাগানের দিকেব বারান্দায় অফিসের জামাকাপড় পরেই বসে আছেন চুপচাপ। পাইপেব ধোঁয়া আর নিবছে না। সারা বাড়ি তামাকেব গন্ধে থমথম করছে। বসার ঘরে সাদা কাঁচের ডোমে একটি মাত্র দুঃখী দুঃখী আলো জ্বলছে। মা কোথায় কেউ জানে না। করুণাকেতনের সেই ছবিটাই লেগে আছে আরতির মনে। নিঃসঙ্গ,পরিত্যক্ত একটা মানুষ। বাবার টাকাতেই মা স্ফূর্তি করত। বাবার টাকাতেই হীরের আংটি, নাকছাবি, দুল। করুণাকেতন ছিলেন কাজ-পাগলা মানুষ। সত্যেন বোসের সেরা ছাত্র।

শ্মশান-চিতায় শোয়ানো হল করুণাকেতনকে। চেহারার এতকালের রুগ্নভাব কেটে যেন ফুলের মতো ফুটে উঠেছেন। আমি শুধু শঙ্কর আর আরতিকে দেখছি। কে বলবে, এরা একই পরিবারের ভাইবোন নয়। দু'জনেই মাথায় প্রায় সমান সমান। শঙ্করের কিশোর-বাহিনীর কিশোররা একটা বেদীতে পাশাপাশি বসে, বড় বড়,

নিষ্পাপ চোখে সব দেখছে। দুটো চিতা জ্বলছে লাফিয়ে লাফিয়ে। একটাতে এক যুবক অন্যটায় একজন মহিলা। মহিলার দশ বারো বছরের ছেলেটি হাতে একটা বাঁশের টুকরো ধরে উবু হয়ে বসে আছে জ্বলন্ত চিতার অদূরে। এক বৃদ্ধ বারে বারে ছেলেটিকে বলছেন, 'নিমু সরে বোস। চিতা থেকে কাঠ গড়িয়ে পড়লে পুড়ে যাবি।' ছেলেটি সেই কথায় বৃদ্ধের দিকে তাকাচ্ছে, কিন্তু সরছে না। তার চোখের দৃষ্টি স্থির। যেন বরফের দু কালি চোখ।

শঙ্করই করুণাকেতনের অনাবৃত দেহে ঘৃত-মার্জনা করল। নিম্নাঙ্গের খণ্ড বস্ত্রটি টেনে নেওয়া হল। এইবার মুখাগ্নি। কাঠের পরে কাঠ। তার ওপর করুণাকেতন। তার ওপর কাঠ। করুণা-কেতনের মুখটি কেবল বেরিয়ে আছে। সেইমুখের ঠোঁট দুটিতে আগুন স্পর্শ করাতে হবে। আরতির হাতে ধরা জ্বলন্ত পাটকাঠি কাঁপছে। শঙ্করই মুখাগ্নি করল। আরতি শঙ্করের কনুইয়ের কাছটা স্পর্শ করে রইল। এইবার চিতার ডান পাশে আগুন ছোঁয়াতেই চিতা জ্বলে উঠল দাউ দাউ করে। করুণাকেতনের দেহ কালো হয়ে উঠছে। আগুনের হাহা হাসি কাঠের গুঁড়ির ফাঁকে ফাঁকে। করুণাকেতনের মাথার তলায় জ্বলন্ত কাঠে বালিশ। মুখটা তখনও অবিকৃত। ওই নিটোল, গোল মাথাটিতে কত পরিকল্পনা ছিল, কত আশা ছিল, ছিল সুখের সন্ধান। একটু পরেই ফেটে যাবে ফটাস করে। তিন চার ঘণ্টা পরে এক মুঠো ছাই। সেই ছাইয়ের নাম করুণাকেতন। কর্মকাণ্ডের মধ্যে পড়ে রইল, আকাশের তলায় একটা চিমনি। যার মাথাটা আশ্বিনের ঝড়ে মচকে গিয়ে বাতাসে দোল খায়। ভাঙা এক জোড়া গেট। অস্পষ্ট একটা নেমপ্লেট। একখণ্ড জংলা জমি। একটা মরচে ধরা বয়লার।

শঙ্কর, আরতি আর তার কিশোরদের নিয়ে গঙ্গার ধারে এসে বসল। আরতি এইবার ভাঙতে শুরু করেছে। শঙ্করের বুকে মাথা রেখে ভেতরে ভেতরে ফুলছে। সকালে আরতির কোমরে হাত ঘষে যাওয়ায় শঙ্করের ভেতরে একটা বেসুরো বেজেছিল। এখনকার এই

ঘনিষ্ঠতায় তার কিছুই মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে, একই প্রাণ এই দেহে, আর ওই দেহে। এই দেহের নাম শঙ্কর বলে তার ভেতরে আগুন ততটা জ্বলছে না। মৃত্যুকে মৃত্যু বলে মনে হচ্ছে। ওই দেহের নাম আরতি, তাই চিতাটা ভেতরেও জ্বলছে। মৃত্যুকে মনে হচ্ছে বিয়োগ, শঙ্করের চিবুকটা ডুবে আছে আরতির চুলে।

অন্ধকার জলধারা সামনে তরতর করছে। ওপারে মিটমিট করছে ঘুম জড়ানো আলোর চোখ। স্লিক স্লিক করে ভেসে যাচ্ছে জেলেডিঙি। কে একজন চিৎকার করে বললে, জোয়ার আসছে। তিনটে নৌকো সঙ্গে সঙ্গে তীর থেকে সরে গেল মাঝগঙ্গায়। বিশাল একটা জেটি এগিয়ে গেছে জলের দিকে। যেন নদীর বুকে স্টেথিসকোপ বসাবে।

অপু হঠাৎ বললে, 'শঙ্করদা, ওই ওনার খুব কষ্ট হচ্ছে না?'

'না রে! ওটা তো দেহ, পুড়ছে। ওতে প্রাণ নেই। তোর জামা প্যাণ্ট খুলে পুড়িয়ে দিলে কষ্ট হবে?'

'তাহলে সব কষ্ট প্রাণে?'

'ধরে নে তাই।'

'প্রাণটা কোথায় গেল? প্রাণ কেমন করে আসে, কেমন করে যায়?'

'তোদের ছাদের ঘুলঘুলিতে পাখি কেমন করে আসে, কেমন করে যায়।'

শঙ্কর হঠাৎ তার সুরেলা ভরাট গলায় গেয়ে উঠল—'এসব পাখি এমনি করে উড়ে বেড়ায় ঘরে ঘরে। একদিন উড়বে সাধের ময়না।' আরতির মাথা ধীরে ধীরে পড়ে যাচ্ছে নিচের দিকে। ক্লান্তিতে, মানসিক বিপর্যয়ে মেয়েটা ঘুমিয়ে পড়ল। আরতির মাথা নেমে এল শঙ্করের কোলে। শঙ্করের নাকে এসে লাগল আগুনের গন্ধ। শঙ্কর আবার গান ধরল। প্রায় শেষ রাতে এক পাত্র ছাই হাতে ফিরে এল শ্মশানযাত্রীরা। শেষ রাতে শ্মশানঘাটে গঙ্গাস্নান। আরতি জীবনে গঙ্গার জলে পা দেয়নি। জলে নামতে ভয় পাচ্ছিল। শঙ্কর বলেছিল,

'আমার কাঁধে হাত রাখো, তোমার কোনও ভয় নেই। আমি তোমাকে ধরছি।' আরতির কোমরের কাছটা সাবধানে ধরে পিছল পাড় বেয়ে দু'জনে নেমে গেল জলে। গেরুয়া রঙের গঙ্গার জল। কনকনে শীতল। আরতি প্রথমটা ভয়ে শঙ্করকে এমন ভাবে জড়িয়ে ধরেছিল, যেন সে ডুবে যাচ্ছে। এইমাত্র এতগুলো মৃত্যু পাশাপাশি দেখেও আরতির প্রাণভয় গেল না। প্রাণভয় কারোরই যেতে চায় না। জলে ভিজে শাড়ি জড়িয়েযাচ্ছিল। স্রোতের টানে খুলে যাচ্ছিল আঁচল। আরতির বুকের কাছে দুলছিল লাল পাথর বসানো একটা হার। শঙ্কর বলেছিল, 'হার সামলে। দেখো, খুলে চলে না যায়।' বলেই তার মনে হয়েছিল, পৃথিবীটা হল বিষয় আর বিষয়ীর। ছোট খাটো লাভক্ষতির চিন্তাটাই আগে আসে। শঙ্কর মনে মনে গেয়ে উঠেছিল, শ্মানপাগল বুঁচকি আগল কাজ হবে না অমন হলে। শঙ্কর বাচ্চাগুলোকে আর জলে নামতে দেয়নি। তাদের গায়ে জল ছিটিয়ে দিল। আশ্চর্য,একটা বাচ্চারও ঘুম পায়নি। সব কটা সমান উৎসাহে বড়দের সঙ্গে লেগে আছে। ঘটি ঘটি জল এনে চিতায় ঢেলেছে। কেবল সব-কটাকেই একটু বিষণ্ণ আর মনমরা দেখাচ্ছে। শঙ্কর এইটাই চেয়েছিল। শঙ্কর আরতি দুজনে যখন পাপাপাশি ভিজে কাপড়ে হেঁটে চলেছে তখনই আমার মন বলছিল,এমনি ভাবে বাকিটা জীবন তারা পাশাপাশিই হাঁটবে।

পরিচালক ভদ্রলোক এইবার একাই এলেন, 'শুনুন আলুঅলা টাকা দিচ্ছে বলে, তার কথাই বেদবাক্য হবে, এমন ভাববেন না। অর্থ দিয়ে সাহিত্য কেনা যায় না। আর আমি ডিরেক্টার, আমারও একটা ফিউচার আছে। আপনি শুধু একটা কাজ করুন, করুণা-কেতনের চিতাটা আরও একটু পরে নেবান। সূর্যোদয় হয়েছে, চিতায় পড়ল প্রথম জল। হু হু ধোঁয়া। সূর্যের প্রথম আলো। বাচ্চাগুলো হাঁ করে, বিস্ময় ভরা চোখে তাকিয়ে আছে ঊর্ধ্বগামী ধোঁয়ার কুণ্ডলির দিকে। তারপর শঙ্কর আর আরতির রোমান্টিক স্নানের দৃশ্য। সকালের রোদ। গঙ্গার জলে চুরচুর ঢেউ। দিনের

প্রথম আলোর সুন্দরী আলেয়া··· ।'

'আজ্ঞে আলেয়া নয় আরতি।'

'আরে মশাই ওই হল। হোয়াট ইজ ইন এ নেম। আপনাদের বড় উপন্যাসে পাত্রপাত্রীর নাম পাকা ক্রিমিন্যালদের মতো ছত্রিশবার পাল্টে যায়, মনে বাখতে পারেন না। শেষে নোট দিতে হয়, শঙ্কব ওরফে শোভন, ওরফে বরেন। ওরফে মিলন। আমার কথা হল, সব কাহিনীরই একজন নায়ক, একজন নায়িকা আর এক পিস ভিলেন থাকে। নায়ক শঙ্কর নায়িকা নিশ্চয় আরতি আর ভিলেন হল গিয়ে ওই রতন হালদার। এখন ভিলেনেব কাজ কী? সেটা অবশ্যই মনে আছে? ভিলেনের কাজ হল নায়ক নায়িকার মিলনে বাধা দেওয়া। এখন আগেরটা বলি। শিফন পরা নায়িকাকে ভিজিয়েছেন। উত্তম করেছেন। তার আগে নায়কের কোলে শুইয়েছেন, অতি উত্তম। গানেব সিকোয়েন্স এনেছেন। বেশ করেছেন। আমার মনের মতো হয়েছে, তবে ওসব ময়না মার্কা গান, একালে অচল। ওখানে একটা মডার্ন লোকসংগীত বসাতে হবে। সে অবশ্য আপনার কাজ নয়। গীতিকার করবেন। কথা হল, রাজকাপুব মশাই জলে ভেজা নায়িকা পেলে কি করতেন? আপনি অমন একটা সিকোয়েন্স অমাবস্যার অন্ধকাবে ফেলে দিলেন। ভিজে কাপড়ে আরতি উঠে আসছে। শঙ্কর তার কোমর ধরে আছে। আরতি উঠছে। সামনে। আরতি হাঁটছে, ক্যামেরা পেছনে। সূর্যের আলো সামনে থেকে চার্জ করছে, সানগান। এদিকে ব্যাকলাইট। শঙ্কর আর আরতি সামনে এগিয়ে চলেছে। আহীব ভাঁয়রোতে একটা গান জাগো, জীবন জাগো, যৌবন জাগো। নার্গিস, রাজকাপুর যেন নতুন করে ফিরে এল। চিত্রজগতে শুরু হল নতুন পুরনো যুগ।'

'শ্মশানে সেকস? জিনিসটা বড় দৃষ্টিকটু।'

'ধুর মশাই। পাবলিক তো এইটাই চায়। তা ছাড়া, সমালোচকরা এর ভেতর থেকে কত বড় একটা মিনিং পাবে জানেন। চিতা, মানে জীবনের শেষ পরিণতি। সেই চিতার সামনে মিলন। সামনে

উদিত সূর্য। জীবনের পথ। পেছনে একদল কিশোর। নবজীবন। নবযুগের প্রতীক। তার মানে মৃত্যুর কাছে জীবন জয়ী। উল্টে গেল, কথাটা হবে জীবনের কাছে মৃত্যু পরাজিত। কত বড় ফিলজফি একবার ভাবুন। নেতারা যেমন বলেন, আমিও আপনাকে সেই-রকম বলি, আপনাদের হাত শক্ত করার জন্যে আমাদের হাত শক্ত করুন। এরপর আপনি ভিলেনটাকে একটু ফিল্ডে নামান। ভিলেন ছাড়া স্টোরি জমে। কে মশাই পয়সা খরচ করে শুধু চিত্তা জলা দেখতে যাবে? একটা জিনিস নতুন এনেছেন, ভালোই করেছেন, এগজিবি-শানিজম। জিনিসটাকে কায়দা করে কাজে লাগান। আরে মশাই মহাভারতের সেই দৃশ্যটার কথা একবার চিন্তা করুন, ফ্যান্টাস্টিক। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ হবে। দুর্যোধন বসে আছে, আরও সব বসে আছে কৌরব পক্ষীয়রা। দুর্যোধন সিল্কের লুঙ্গি তুলে উরু বেব করে চাপড় মেরে বলছে, এসে সুন্দরী, এসো, বোসো এইখানে। মাই ডারলিং উঃ, এগজিবিশানিজমের কি অসাধারণ প্রয়োগ। শুনুন মশাই এদেশে অরিজিন্যাল বলে কিছুই নেই, সবই কপি। স্টোরি কপি, মিউজিক কপি, বিজ্ঞাপন কপি। অরিজিনাল হয় বিলেতে। আপনি মহাভারত থেকে ঝট করে ঝেড়ে দিন। মেয়েটার বাপটাকে মেরেছেন। মেয়েটা এখন ওপেন টু অল। রতন ব্যাটাকে দু'পাত্তর গিলিয়ে ঠেলে দিন মেয়েটার ঘরে। পরনে লুঙি, উদোম গা। মুখে সিগারেট। চেয়ারে গিয়ে বসল। মেয়েটা কিছু বলতে পারছে না। ভদ্র, শিক্ষিতা মেয়ে। রতন হাঁটুর ওপর লুঙি তুলে এলিয়ে বসে আছে। চোখ নাচাচ্ছে। মিটমিটি হাসছে। মুখে চুকচুক শব্দ করছে। যেন বেড়ালকে ডাকছে দুধ খেতে।'

'কোনও কারণ ছাড়া ঘরে ঢুকে পড়বে? মামার বাড়ি নাকি?'

'ফিল্মের গোটাটাই তো মামারবাড়ি। আমার ওই সিচুয়েশানটা চাই, আপনি এবার মাথা খাটান। সেদিনেই তো বলেছি, তোমার আছে সুর, আর আমার আছে ভাষা। মনের কোণে আছে যত দুষ্টুমির বাসা।'

ভদ্রলোক পুকুরে চার ফেলে বিদায় নিলেন। করুণাকেতন যে খাটে এতকাল শুয়েছিলেন সেই খাটটি শূন্য। যেন বিশাল একটি হাহাকারের মতো ঘর জুড়ে পড়ে আছে। ঘরের কোণে ওপাশে একটা প্রদীপ জ্বলছে। আরতি বসে আছে চেয়ারে। সামনে টেবিল। টেবিলে জ্বলছে ল্যাম্প। রাত প্রায় আটটা সাড়ে আটটা হবে। প্রদীপ জ্বেলে রেখে গেছেন শঙ্করের মা। করুণাকেতন যতদিন ছিলেন, শঙ্করের মা বড় একটা আসতেন না। পঙ্গু হয়ে মানুষটি পড়ে থাকলেও তাঁকে ঘিরে ছিল অহঙ্কারের একটা বলয়। সেই কথায় বলে, 'মরা হাতি লাখ টাকা।' এখন শঙ্করের মা অসহায় মেয়েটাকে অসম্ভব ভালবেসে ফেলেছেন। এমন জীবন তিনি দেখেননি, মৃত্যুর পর একজনও এল না পাশে দাঁড়াতে। আত্মীয় স্বজন অবশ্যই আছে। বড় বংশের ছেলে ছিলেন করুণাকেতন। বড়রা বোধহয় এইরকম নিঃসঙ্গই হয়। শঙ্করের মা সারাদিনে বহুবার এই ঘরে চলে আসেন। এসে খাটের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন চুপ করে। এই বয়সে মৃত্যুর প্রতি মানুষের স্বাভাবিক একটা কৌতূহল জন্মায়। কি অদ্ভুত, এই ছিল, এই নেই। শঙ্করের মা আরতিকে মেয়ের মতো গ্রহণ করেছেন।

আরতি আলো জ্বেলে তাকে লেখা বাবার পুরনো চিঠি পড়ছে। আরতি যখন রাজস্থানের স্কুলে পড়ত, সেই সময়কার চিঠি। তখন বাড়ির অবস্থা রমরমা। রাজস্থানে সেই স্কুলে, রাইডিং শুটিং সবই শেখাত। আরতি অতীতে চলে গেছে। এদিকে রতন হালদার গুটিগুটি ঢুকছে। সর্বনাশ করেছে। লুঙ্গি, গেঞ্জি পরেনি অবশ্য। বেশ ভদ্র সাজগোজ। আজ বৃহস্পতিবার। মদ মনে হয় খায়নি। আজ তো ড্রাই-ডে। পা অবশ্য টলছে না। রতন দরজার সামনে দাঁড়িয়ে একবার কাশল। আরতি চিঠিতে এত বিভোর, শুনতেই পেল না। তখন রতন বললে, 'আসতে পারি দিদি?'

'কে?' চমকে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল আরতি। দরজার সামনে এসে রতনকে দেখে ভয় পেয়ে গেল। তবু ভদ্রতা। বললে, 'আসুন,

আসুন।'

'দিদি, আমি খারাপ লোক। আমার খুব বদনাম। অশিক্ষিত। ছোট ব্যবসা করি। মাল খাই। বউ পেটাই। আমার ভেতরে যাওয়া উচিত হবে না। আমাব পিতা মারা গেছেন। আমি মাদ্রাজ গিয়েছিলুম। আজ ফিরেছি। খবরটা শুনে আমার ভীষণ মন খারাপ হয়ে গেছে। আপনার মতো বয়সে আমিও আমার পিতাকে হারিয়েছিলুম। পিতার মৃত্যু কত দুঃখের, আমি জানি। বাবা তারকেশ্বর আপনাকে ভালো রাখুন। আমি আপনার জন্যে খুব ভালো দোকানের মিষ্টি আর কিছু ফল এনেছি। আর একটা মালা এনেছি, আপনার পিতার ছবিতে পরাবার জন্যে। আমি খুব শুদ্ধভাবে এনেছি। আজ আমি কোনও নেশাভাঙও করিনি।'

আরতি লক্ষ্য করল, রতন হালদারের চোখে জল এসে গেছে। আরতি অবাক হয়ে গেল।

'যাবো? যদি কেউ কিছু ভাবে?'

'ভাবে, ভাববে। আপনি আসুন।'

জমিদারের ঘরে যে-ভাবে প্রজা ঢোকে, রতন সেই-ভাবে ভয়ে ভয়ে, চোরের মতো ঢুকে মেঝেতে বসতে যাচ্ছিল। আরতি বললে, 'ও কি করছেন? চেয়ারে বসুন। চেয়ারে।'

রতন জড়োসড়ো হয়ে চেয়ারে বসল। মালার প্যাকেটটা আরতির হাতে দিয়ে বললে, 'ছবিতে পরিয়ে দেবেন?'

'আপনি পরিয়ে দিন না।'

'আমি ছবি ছোঁবো?'

'কেন ছোঁবেন না। ছুঁলে কি হবে?'

'আমাকে সবাই চরিত্রহীন বলে তো। তবে বিশ্বাস করুন, আমার চরিত্রে কোনও দোষ নেই। আমি একটু মদ খাই। সে আমার নিজের রোজগারে খাই। না খেলে আমার জীবনের অনেক দুঃখ ভুলতে পারবো না বলে খাই। বউকে আমি যেমন পেটাই আমার বউও তেমনি আমাকে ক্যাঁত ক্যাঁত করে লাথি মারে। কি

মুখ! যেন নালা-নর্দমা। আবার কি বলে জানেন, বিয়ের আগে প্রফেসারের সঙ্গে প্রেম করতো। কত দুঃখ দেখুন, আজও আমাদের কোন ছেলেপুলে হল না। কি বলে জানেন! আমি মদ খাই বলে হচ্ছে না। তাহলে তো বিলেতে কারোর ছেলেপুলে হত না।'

হঠাৎ রতন হালদার নিজের দু' কান ধরে জিভ কেটে বলল, 'ছিঃ ছিঃ, আপনার সামনে এসব আমি কি কথা বলছি! অশিক্ষিত হলে যা হয়।'

রতন হালদার খাটের ওপর বালিশে হেলানো করুণাকেতনের ছবিতে মালা পরিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালো। তারপর চেয়ারে না বসে বললে, 'আমি তেজস্বী মানুষকে ভীষণ শ্রদ্ধা করি। আমি যা শুনেছি, তাতে আপনার পিতাকে ভীষণ তেজস্বী মনে হয়েছে। আপনিও তেজস্বী। আপনার মনে আছে, একদিন আমি আপনার হাত ধরেছিলুম। আপনি আমাকে ভুল বুঝে বলেছিলেন, জুতো মারবো। আমি তখন ব্যাপারটা বোঝাবাব মতো অবস্থায় ছিলুম না। নেশার ঘোরে পড়ে যেতে যেতে আমার মনে হয়েছিল আপনি আমার স্ত্রী। বিশ্বাস করুন, আমার ভুল হয়েছিল। আমি নিজের স্ত্রী ছাড়া অন্য সকলকে দেবীর মতো শ্রদ্ধা কবি। এ আমার গুরুর নির্দেশ।'

ঠিক এই সময় শঙ্কর ঘরে এসে রতনকে দেখে বললে, 'এ কি, আপনি এখানে?'

আরতি বললে, 'না, না, কোনও ভয় নেই শঙ্করদা। ইনি খুব সুন্দর মানুষ। আমরা সবাই দূর থেকে এতদিন এঁকে ভুল বুঝে এসেছি। ইনি প্রকৃত ভদ্রলোক। কাছে না এলে মানুষকে ঠিক বোঝা যায় না।'

রতন শঙ্করের দিকে ঘুরে বললে. 'নমস্কার, শঙ্করবাবু। জানি, একটা কারণে আপনি আমার উপর খুব রেগে আছেন। আপনি আদর্শবাদী, সমাজসেবক, চরিত্রবান, কালীভক্ত, শিক্ষিত, সুন্দর, আপনি সব সব। আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি। এও জানি, আপনি

তিন-চারবার পুলিসের কাছে আমার নামে কমপ্লেন করেছেন। আমি তার জন্য আপনার ওপর এতটুকু রাগ করিনি। কেন আমি মদ খাই জানেন? আমার মা আর আমার ওই লাল পিঁপড়ে বউটার জন্যে। কি সাংঘাতিক কামড়, আপনি জানেন না! আর একটা জিনিস আপনি জানবেন, মদ খেলেই বউকে পেটাতে ইচ্ছে করবে। তাহলে জিনিসটা কি দাঁড়াল, বউয়ের জন্যে মদ, মদের জন্যে বউকে পেটানো। একটা গোলাকার ব্যাপার। আমার কি দোষ বলুন। আমি কি পেটাই? পেটায় আমার পেটের বোতল। জানেন কি আমার কোনও দাম্পত্য জীবন নেই।'

'আপনার ওই রুগ্ন স্ত্রীকে দিয়ে রোজ সকালে ভারি লোহার উনুনটা তোলান কেন। নিজে পারেন না।'

'কেন পারবো না, ওই তো আমাকে তুলতে দেয় না। আমার কোমরে একটা ফিক ব্যথা মতো আছে। মাঝেমাঝেই কষ্ট দেয়। তা আমার বউ বলে, ওই ভারি উনুন তুলতে গিয়ে চিরকালের মতো বিছানায় পড়ে গেলে কোন মিঞা দেখবে?'

'তার মানে আপনার স্ত্রী আপনাকে ভীষণ ভালোবাসেন।'

'বাসেই তো। আমিও ভীষণ ভালবাসি, ওই তো আমার একটি মাত্র স্ত্রী। জানেন তো জীবনে স্ত্রী একবারই আসে। রাখতে পারলে রইল, না রাখতে পারলে গেল।'

'তাহলে অমন চিৎকার চেঁচামেচি, গালিগালাজ করেন কেন?'

ছোটবেলা থেকে ওইটাই আমার আদত। জানেন তো মানুষ আসলে বাঁদরের জাত। আপনারা যাঁরা পড়ালেখা করেন তাঁরা জানেন। ঠিক মতো ট্রেনিং না পেলে আমার মতো দামড়া হয়ে যায়। ছেলেবেলায় বাবা আমাকে শুধু রতন বলতেন না। বলতেন, দামড়া রতন। আর আমার বউ, আমার এই স্বভাবটাই পছন্দ করে। চিৎকার, চেচাঁমেচি যেদিন কম হয়, সেদিন জিজ্ঞেস করে, কি গো তোমার শরীর ঠিক আছে তো?'

'তা এই যে বললেন, আপনার দাম্পত্য জীবন নেই।'

'সেটা হল, ছেলেপুলে না থাকলে দাম্পত্য জীবনের কি হল বলুন? তারপর তো ওই শরীর। ছত্রিশটা ব্যামো। সম্প্রতি যোগ হয়েছে ছুঁচিবাই। এইবার আমাকে বলুন, আমি কাকে পাশে নিয়ে শুই? বউ না ডিসপেনসারি। আমার এতখানি শরীর। তাই আমি মদ খাই। মদে একটা জিনিস হয়, চরিত্রটা মদেই আটকে থাকে। আর বেশি নড়াচড়া করতে পারে না।'

'এই যে বলছেন, স্ত্রী আর মায়ের জন্য মদ ধরেছেন।'

'সে কথাও ঠিক। রোজ মশাই দম খাটা খেটে বাড়ি ফেরার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল কীর্তন। মা আসে বউ হয়-এর নামে বলতে, বউ আসে মায়েব নামে বলতে। লে হালুয়া।'

রতন হালদার জিভ কেটে কান মললেন, 'এই আমার চরিত্র। কোথায় কি বলে ফেলি। মুখ নয় তো···।'

রতন তাড়াতাড়ি নিজের মুখ চেপে ধরে ঢোঁক গিলল। গিলে মুখ থেকে হাত সরিয়ে বললে, 'বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা। কি বেরোতে চাইছিল। আর এই হল রতন হালদার। লক্ষ্মী ক্লথ স্টোরের মালিক। লক্ষ্মী হল আমার স্ত্রীর নাম। তা নামটা মিলেছে জানেন। আসার পর থেকে রোজগারপাতি বেড়েছে। তা হয়েছে। ছোটলোক হতে পারি মিথ্যেবাদী তো নই। না আমি এবার যাই। আমার বউ একেবারে সিটিয়ে আছে। আসার সময় বলেই দিয়েছে, যাচ্ছ যাও, খুব সাবধান। যা-তা বলে মোরো না। খুব একটা যা-তা কিছু বলিনি, কি বলুন? খালি একটা শব্দ লিক করছিল।'

রতন আবার খাটের দিকে হাত তুলে নমস্কার করল তারপর যেমন এসেছিল, সংযত হয়ে মাথা নিচু করে বেরিয়ে গেল। আমি অবাক। শঙ্কর আর আরতিও অবাক। শঙ্কর তৈরিই ছিল, এলো-মেলো কিছু করলে, জীবনের প্রথম ঘুসিটা রতনের চোয়ালে গিয়েই পড়বে।

শঙ্কর বললে, 'এত সহজ সরল মানুষ আমি কমই দেখেছি।'

টেবিলের ওপর সাজানো রয়েছে রতন হালদারের আনা শহরের

সেরা, আপেল, মুসাম্বি, আতা, সফেদা, কলা। বিশাল এক বাক্স সন্দেশ। করুণাকেতনের ছবিতে ঝুলিয়ে দিয়ে গেছে, টাটকা গোড়ের মালা। তলায় ঝুলছে টাটকা একটা গোলাপ। রোলেক্স চিক্‌চিক্ করছে, আনন্দাশ্রুর মতো।

রতন হালদার তক্ষুনি আবার ফিরে এল। হাতে একটা বেশ বড় রঙিন প্যাকেট।

ঘরে সেই একই ভাবে সমীহ হয়ে ঢুকলো, 'একটা জিনিস ভুলে ফেলে এসেছিলুম। ধূপ। থেকে থেকে, ঘরের চারপাশে জ্বালিয়ে দিন। আমি আর দাঁড়াচ্ছি না। এদিকে এক কাণ্ড হয়েছে, আমার বউকে মনে হয় কাঁকড়া বিছে কামড়েছে। সেই কথায় বলে না, গোদের ওপর বিষ ফোঁড়া। আমি যাই দিদি।'

শঙ্কর আর আরতির সেই রাতটা রতন হালদারের বউকে নিয়েই কেটে গেল। ডাক্তার, ইঞ্জেকসান, বরফ, পাখার বাতাস। সেবা। সব মিলিয়ে একটা রাত। মৃত মানুষের আত্মা এই খেলাটাই খেলেন। দুঃখ ভোলবার জন্যে একের পর এক বিপদ তৈরি করতে থাকেন। যাতে সব একেবারে তালগোল পাকিয়ে থাকে। মাথা না তুলতে পারে। সেই রাতেই রতন হালদারকে চেনা গেল। লোকটা কত খাঁটি। সারাটা রাত তার দৌড়ঝাঁপ। ছোটাছুটি। মনে হচ্ছিল, তার স্ত্রীকে নয়, বিছে তাকেই কামড়েছে। রতন যেন সেই প্রবাদ—শাসন করে যে-ই, সোহাগ করে সে-ই। ভোরের দিকে মনে হল, বিপদটা কেটে গেছে। একে রোগা শরীর তার ওপর বিছের কামড়। বিছে মানে বিছের রাজা, কাঁকড়া বিছে, প্রায় সাপের সমান। রতন হালদার ঠিকই বলেছে, তার বউয়ের শরীরে হাড় কখানাই সার। স্রেফ ভেতরের তেজে মহিলা লড়ে যাচ্ছেন। রতন হালদার সত্যই সংযমী। অন্য কেউ হলে নারীসঙ্গের জন্য ছটফট করত। মদে আরও বাড়িয়ে দিত তার নারী-লিপ্সা। আর একটা ব্যাপার জানা ছিল না সেটা হল রতনের ঈশ্বর-বিশ্বাস। দেয়ালের হুক থেকে ঝুলছিল রুদ্রাক্ষের মালা। রতন মাঝে মাঝেই সেই মালাটা নামিয়ে ঘরের

কোণে বসে যাচ্ছিল জপে। সেটা এত আন্তরিক, যে কেউ বলতেই পারবে না, এটা ভণ্ডামি। কেউ হাসতেও পারবে না, নিউক্লিয়ার এজে, জপের শক্তি, ব্যাটা অশিক্ষিত গেঁয়ো কোথাকার।

মিনিবাস ছুটছে হুই হুই করে। জানালার ধারে বসে আছে আরতি পাশে শঙ্কর। আরতির রুক্ষ চুল বাতাসে উড়ছে। করুণাকেতনের মৃত্যু আরতি সহজভাবেই নিয়েছে। কষ্ট পাচ্ছিলেন ভীষণ। চলে গেলেন। আরতি এখন নিজের জীবনের পরিকল্পনা নিয়েই ব্যস্ত। বাগানবাড়ির দখলটা পেয়ে গেলেই সে একট নার্সারি, কেজি স্কুল করবে। সে যোগ্যতা তার আছে। সে ঘোড়ায় চড়তে জানে, সে বন্দুক চালাতে জানে। ইংরেজি জানে সাংঘাতিক ভালো। ওই স্কুল কালে বড হবে। বিশাল এক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। বাবার নামে নাম রাখবে সেই প্রতিষ্ঠানের—করুণাকেতন।

কণ্ডাক্টর কাছে আসতেই শঙ্কর পকেটে হাত ঢোকাতে যাচ্ছিল, আরতি সঙ্গে সঙ্গে শঙ্করের হাত চেপে ধরল। খুব আস্তে বললে, 'এরই মধ্যে ভুলে গেলেন, আমাদের কাল রাতেব চুক্তি।'

শঙ্কর আরতির আঙুলগুলো দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। ঈশ্বর যাকে দেবেন মনে করেন, তার সবই ভাল করে দেন। লম্বা লম্বা মোচার কলির মতো আঙুল। একেবারে দুধে-আলতা রঙ। ডগাগুলো সব টোপর টোপর গোলাপি। অনামিকায় একটা টুকটুকে লাল পাথর বসানো সোনার আংটি। যা মানিয়েছে। চোখ ফেরানো যায় না। শঙ্করকে ওইভাবে মুগ্ধ হয়ে যেতে দেখে আবতি বললে, 'কি হল আপনার?'

'তোমার আঙুল। ঠিক যেন নন্দলাল বসুর ছবি।'

'এই রকম আঙুল আপনি কত মেয়ের পাবেন। আপনি মেয়েদের সঙ্গে মেশেন, যে জানবেন?'

'তুমি এই আঙুলে বন্দুক ছুঁড়তে?'

'হ্যাঁ। আমার টার্গেট খুব ভালো ছিল। সত্যি রাজস্থানের সেই দিনগুলো ভোলা যায় না। আমার জীবনের সবচেয়ে ভালো দিন।

দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইল না, রইল না, সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি।'

শঙ্কর হঠাৎ মুখ তুলে দেখে একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেল। কণ্ডাক্টর ছেলেটি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে চুপ করে। সে-ও অবাক হয়ে আরতিকে দেখছে। টিকিটের পয়সা নিতে নিতে বললে, 'দিদি, আমি এত বছর কণ্ডাক্টারি করছি, আপনার মতো সুন্দরী দেখিনি। মনে হচ্ছে জ্যান্ত মা দুর্গা। আপনি কেন সিনেমায় নামছেন না দিদি। সুচিত্রা সেনের পর আর তো একই সঙ্গে অত সুন্দরী আর শক্তিশালী কেউ এলেন না।'

আরতি বললে, 'সিনেমায় নামা কি অত সোজা ভাই?'

'আপনি একটু চেষ্টা করলেই চান্স পেয়ে যাবেন।'

আবতি আর শঙ্কব ভবানীপুরে নেমে পড়ল। আরতিদের অ্যাড-ভোকেট ভবতোষবাবুর চেম্বারে যখন গিয়ে পৌঁছলো, তখন সন্ধ্যা হয় হয়। ভবতোষবাবু কোর্ট থেকে ফিরে সবে বসেছেন। এক মারোয়াড়ী মক্কেল রাজস্থানী বাংলায় খুব ক্যাচোর-ম্যাচোর করছেন। আরতিকে আসতে দেখে ভবতোষবাবু বললেন, 'একটু চুপ করুন।'

আবতির এমনই প্রভাব ভবতোষবাবু চেয়ার ছেড়ে প্রায় উঠেই পড়েছেন, 'এসো মা এসো।

সামনের চেয়ারে বসতে বসতে আরতি বললে, 'বাবা, মারা গেছেন কাকাবাবু।'

মুখে মশলা দিতে যাচ্ছিলেন ভবতোষবাবু, তাঁর হাত নেমে এল। বললেন, 'যাঃ, একটা যুগ শেষ হয়ে গেল।'

ব্যবসায়ী ভদ্রলোক পাশ থেকে আরতিকে দেখছেন হাঁ করে। শঙ্করের মনে হল মনে মনে তিনি হিসেব করছেন, 'ভাও কিতনা।'

ভবতোষবাবু বললেন, 'তোমরা জানো না করুণাদা কত বড় ফাইটার ছিলেন? হি ওয়াজ এ গ্রেট সোল।'

কাজের মানুষ। সেন্টিমেন্ট নিয়ে পড়ে থাকার সময় নেই। ওই এক মিনিট নীরবতা পালনের মতো দু'কথাতেই সেরে দিয়ে আসল

কথায় এসে গেলেন, 'খুব নিষ্ঠুরের মতোই বলছি মা, করুণাদা মারা গিয়ে তোমার কিছুটা সুবিধে করে দিলেন। কেসটাকে এবার আমি অন্যভাবে প্লেস কবতে পারবো। তুমি এখন হেল্পলেস, অসহায়। তোমার কেউ নেই। অ্যালোন ইন দিস ওয়ার্লড। বাই দি বাই, এই ছেলেটি কে? এত সুন্দর, স্বাস্থ্যবান, উজ্জ্বল যুবক, একালে সহসা দেখা যায় না।'

'আমরা একই বাড়িতে থাকি। আমার বন্ধু আমার দাদা, আমার শিক্ষক, আমার আদর্শ, আমি ঠিক বোঝাতে পারবো না, ইনি কে। একটি রেয়ার স্পেসিমেন, আই ক্যান সে।'

'ছেলেটিকে আমার ভীষণ ভালো লেগে গেল। আজকালকার খুব কম ছেলেই আমাকে মুগ্ধ করতে পারে। তুমি কি ব্রহ্মচর্য পালন করো?'

শঙ্কর বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'ভেরি গুড। তুমি আমার বইটা পড়েছ? ইন প্রেইজ অফ ব্রহ্মচর্য।'

'বইটা আপনার লেখা? আপনি সেই ভবতোষ আচার্য! আপনার ওই বই-ই তো আমার ইন্সপিরেসান।'

শঙ্কর ঝট করে চেয়ার ছেড়ে উঠে ভবতোষবাবুকে প্রণাম করল। ভবতোষবাবু সোজা দাঁড়িয়ে উঠে শঙ্করকে জড়িয়ে ধরলেন বুকে। সেই অবস্থায় এক হাতে শঙ্করের পিঠ চাপড়াতে লাগলেন। দু' হাতে, শঙ্করের দু' কাঁধ ধরে, সামনে সোজা দাঁড় করিয়ে, শঙ্করকে দেখতে দেখতে বললেন 'চেস্ট কত?'

'ছেচল্লিশ।'

'ভেরি গুড।'

শঙ্কর ফিরে এসে চেয়ার বসল। মাড়োয়াড়ী ভদ্রলোক অবাক করে বাঙালীদের কাণ্ডকারখানা দেখছিলেন, অবশেষে থাকতে না পেরে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেসটা কি ছিল? প্রোপার্টি। কি ড্যামেজ স্যুট।'

ভবতোষবাবু বললেন, 'প্রপার্টি। হিউম্যান প্রপার্টি।'

'বিষোয় বিষ আছে। আমি তো মেশাই পাগোল হয়ে গেছি। চার ছেলেকে চারটে প্রোপার্টি দিলিয়ে দিলুম, লেকিন শান্তি হোলো না দাদা। বোড়োটা ওখোন বলছে কি, আমাকে আরো দাও। মেজোর মকানের সামনে দিয়ে পাতাল রেল গেছে। আরে উল্লুকা পাঠঠে মেজোর তো ফ্ল্যাট। তোর তো বাগানবাড়ি। একটা গাড়ি নতুন মোডেল, আর একটা গাড়ি প্রানা মোডেল। আমি কি দিল্লি যাবো। দরবার লাগাবো। বেলেঘাটামে পাতাল রেল চালিয়ে দাও। মোশা আমি ভাবছি কি ভিখিরি হোয়ে যাই। জোয় রাম। দেখি একটা হুমন লাগাই, কি দোশ মণ ঘিউ ঢালি।'

'আপনার তো মশাই টাকায় ছাতা পড়ছে। এক বস্তা দিয়ে দিন না।'

'টাকা তো আমাদের কাছে টয়লেট পেপার। নো ভ্যালু। আমরা চাই রিয়েল এস্টেট। সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউতে নো বাড়ি। এদিকে কুছু আছে পুরনো বাঙালি বাড়ি। চেষ্টা তো চালিয়েছি। লেকিন সোব লিটিগেশানে আটকে আছে। ফ্রি প্রোপার্টি কোথায়? এই আপনারটা ফ্রি আছে। হামি এক কোটির অফার দিয়ে রাখছি।'

'দশ বছর আপেক্ষা করুন। আমি আগে মরি।'

'লেকিন আপনি মোরলেই তো লিটিগেশানে চলে যাবে। যা করবেন মরার কম সে কম সাতদিন আগে করুন।'

'আমি কনট্যাক্ট করে ফাইন্যাল ডেটটা জেনে নি।'

মারোয়াড়ী ভদ্রলোক হা হা করে হাসলেন।

ভবতোষ আরতিকে বললেন, 'ডেথ সার্টিফিকেটটা আমাকে আগে পাঠাও। ফাইনাল লড়াইটা শুরু করা যাক। তোমাদের দুজনের বিয়ে হলে আমি খুব খুশি হব। তবে কেসটা ফয়সালা হবার আগে নয়। ফাইন ইয়াং ম্যান, তোমার নামটা কি?'

'আজ্ঞে আমার নাম শঙ্কর মুখার্জি।'

'আরতিকে তোমার পছন্দ?'

'আমি বেকার। আমার বোনের এখনও বিয়ে হয়নি। বিয়ের বাজারে আমি অচল কাকাবাবু।'

'তুমি অচল থাকবে না শঙ্কর। তুমি সচল হয়ে যাবে। যদি তুমি বিবাহ করো, আরতিকে করো। আমি নিজে আরতিকে সম্প্রদান করবো তোমার হাতে। যাও। তোমাদের মঙ্গল হোক। এইবার আমকে কাজ করতে দাও।'

ত্বজনে হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর চলে এল। আরতি বললে, 'শঙ্করদা, আপনি ছাড়া সত্যিই কিন্তু আমার আর কেউ নেই! এই পৃথিবীতে আমি কিন্তু একেবারে একা। এই কথাটা আপনাকে মনে রাখতে হবে। আমি কি খুব বেশি দাবি করে ফেলছি?'

'আরতি, তোমার স্বামী হবার যোগ্যতা আমার নেই, তবে এইটুকু বলতে পারি, যতদিন প্রয়োজন হবে, আমি তোমার ম্যানেজারী করবো। আমি তোমাব সেবা করবো। আমি কামজয়ী নই। কোনও মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় কামজয়ী হওয়া। চেষ্টা কববে, হারবে, আবার চেষ্টা করবে। বাইরে একটা ভাব দেখাবে নির্বাকার, কিন্তু ভেতর ভেতর জ্বলে পুড়ে যাবে। তবে নিজেকে নানাভাবে ব্যস্ত রাখলে আক্রমণটা কম হবে। সত্যি কথা বলবো, তোমাকে কখনও মনে হয় প্রেমিকা, কখনও মনে হয় আমার আদরের ছোট বোন। ত্ব'রকমের ভাব হয় আমার। তবে তৃতীয় আর একটা ভাব ভীষণ প্রবল তোমাকে আগলে রাখা, তোমাকে সামলে রাখা, তুমি আমার এত আদরের যে তোমার গায়ে যেন কোনও কিছু স্পর্শ না লাগে। কর্কশ জীবন, কর্কশ সময় যেন তোমাকে ছুলে না দেয়। আমার চোখে, তুমি হলে পৃথিবীর সুন্দরতম ফুল। তুমি বলবে, হঠাৎ আমার এমন ভাব হল কেন? আমি বলব, এইভাবেই হয়। তোমার ওই ভুরু কোঁচকানো হাসি, তোমার কণ্ঠস্বর, তোমার কথা বলার ধরন—এইগুলো হল তোমার ব্যক্তিত্বের দিক, আমাকে এক কথায় কাবু করে ফেলেছে। তুমি প্রথম আমাকে চুম্বকের মতো টেনেছিলে সেই ফুলের দোকানের সামনে। পাশ থেকে রোদঝলসানো

তোমার ধারালো মুখ দেখে, তোমার চাবুকের মতো শরীর দেখে আমি আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলুম। তোমার কাছে আমি নিজেকে লুকোতে চাই না, গোপনীয়তাটাই পাপ। সেদিন তোমার ঘামে ভেজা কোমর ছুঁয়ে আমার ডান হাত এগিয়েগিয়েছিল বালতি থেকে নোট তুলতে। সেই স্পর্শে আমি পেয়েছিলুম বিদ্যুৎ-তরঙ্গ। সেদিন আমি তোমার প্রেমিক। আবার যেদিন শ্মশানে, গঙ্গারধারে আমার বুকে মাথা রাখলে, তখন মনে হচ্ছিল আমাদের দু'জনের পিতৃবিয়োগ হয়েছে। আমরা দুটি ভাইবোন। আমার শেষ রাতে স্নানের পর তোমাকে যখন ভিজে কাপড়ে জল থেকে তুলছিলুম তখন মনে হচ্ছিল তুমি আমার নায়িকা। এইবার বলো আমাকে তোমার কেমন লাগে? আমার সম্পর্কে তোমার কি ভাব?'

দু'জনে অন্ধকার মতো একটা জায়গায় চলে এসেছে। দোকান-পাট নেই। কিছুটা দূরে আবার আলোর এলাকা। ডানপাশে একটা পার্ক। আরতি দাঁড়িয়ে পড়ল। শঙ্করকে বললে, 'আমার মুখটা এই আলোছায়ায় তুমি দেখ। যে কথা বলা যায় না, সে কথা ফুটে ওঠে মুখে।'

শঙ্কর আকাশের আলোয় আরতির মুখের দিকে তাকাল। এ মুখ নায়িকার। চোখ দুটো যেন ইরানী ছুরি। পাশ দিয়ে এক প্রবীণ যেতে যেতে বললেন,'উচ্চি পোকা পড়েছে চোখে। অন্ধকারে হবে না, আলোতে নিয়ে যাও। নরম রুমালের কোণ দিয়ে টুক করে তুলে নাও। বাড়ি গিয়ে দু ফোঁটা গোলাপজল।'

পরিচালক আর প্রযোজক দু'জনেই এসেছেন আজ, সাদা রঙ-চটা একটা অ্যামবাসাডার চেপে। যাক, আর কিছু না হোক, একটা বাহন হয়েছে। প্রযোজক বললেন, 'স্টোরির কি খবর?'

'এই খবর।'

'সে কি ভিলেনটাকে মেরে ফেললেন!'

'মারিনি তো, মানে মারিনি তো। এখন আমি আর লিখছি না। আমি আজ্ঞাবহ দাসমাত্র।'

'ওই হল। ও সব আপনাদের অনেক ভড়ং আছে। ধর্মের পথ মানেই মৃত্যুর পথ। স্টোরিটার আর কি রইল। তারপর আবার সেই রাত। আপনি নায়ক-নায়িকাকে একটা ঘনিষ্ঠ অবস্থায় নিয়ে এলেন, এনে কি করলেন, ডুবিয়ে দিলেন অন্ধকারে। আপনাকে অন্ধকারে পেয়েছে।'

পরিচালক বললেন, 'না, না, আধো অন্ধকার ডানপাশে একটা পার্ক, ইরাণী ছুরির মতো চোখ, আমার ক্যামেরার পক্ষে খুব ভালো। এ-সব মফট সিন। এর মর্ম আপনি বুঝবেন না। আপনি শুধু দয়া করে ওদের পার্কের মধ্যে ঢুকিয়ে দিন, তারপর খেল কাকে বলে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।'

প্রযোজক বললেন, 'তারপর কি হবে,পুলিস দু ব্যাটাকেই মারতে মারতে নিয়ে যাবে ভবানীপুর থানায় ?'

পরিচালক বললেন, আজ্ঞে না, এইখানেই আসবে নতুন এক ভিলেন, প্রেমের ঘুঘুটির পালক ছেঁড়ার জন্যে। আর প্রেমিক মোরগটির সঙ্গে লেগে যাবে ঝটাপটি। ফাইট সিকোয়েন্স।

প্রযোজক বললেন, 'আমি সাফ কথা জানতে চাই, শঙ্কর আর আরতির বিয়ে হবে কি হবে না।'

পরিচালক বললেন, 'বলুন কি হবে ?'

এই ঘটনার ঠিক তিন দিন পরে একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল আরতিদের বাড়ির সামনে, নেমে এলেন ভবতোষ আচার্য ও আর এক ভদ্রলোক। শঙ্কর বেরোচ্ছিল পড়াতে যাবে বলে।

ভবতোষ বললেন, 'এই যে আমার ইয়ংম্যান, আরতি আছে ?'

'আছে কাকাবাবু। আসুন, ভেতরে আসুন।'

আরতি সবে চান সেরে চুলের জট ছাড়াচ্ছিল। ভবতোষ বললে, 'মা দেখ কে এসেছেন ?'

আরতি বললে, 'কে, রাধুকাকা !'

'দু'জনে ঘরে ঢুকলেন। ভবতোষ শঙ্করের মুখের ওপর দরজাটা বন্ধ করতে করতে বললেন, 'ইয়ংম্যান, আমরা একটু একান্ত বৈষয়িক

কথা বলব, বাবা। যাবার সময় দেখা করে যাবো তোমার সঙ্গে।'

শঙ্করের মা জিজ্ঞেস করলেন, 'কে রে শঙ্কু?'

'আরতিদের উকিলমশাই। তুমি একটু চা বসাও মা। আমি খাবার কিনে আনি। মস্ত মানুষ। আমার গুরুও বলতে পারো।'

রাধুবাবু বললেন, 'করুণা মারা গেছেন আমি শুনেছি। তুমি আমার বন্ধুকন্যা। তোমার প্রতি আমার একটা কর্তব্য আছে। বলতে পারো, স্রেফ জেদাজেদির বশে এই কোর্ট-কাছারি-মামলা। আমি এখন আমার সেনসে ফিরে এসেছি। আর মামলা নয়। এই-বার সহজ সমাধান। এই পরিবেশে তোমার আর এক মিনিট থাকা চলবে না।'

'চোদ্দ বছর রয়েছি কাকু।'

'সে তোমার বাবার জেদে। আর না, প্যাক-আপ, প্যাক-আপ।'

ভবতোষ বললেন, 'প্যাক আপ, প্যাক আপ।'

'কোথায় যাবো আমরা?'

'বারাসাতে, তোমার বাগানবাড়িতে। যা আমি আজ চোদ্দ বছর আগলে বসে আছি। দেখবে চলো, সেখানে তোমার মানসদা কি করেছে? বিশাল এক নার্সিং হোম। সেই নার্সিং হোমের নাম হবে, করুণাকেতন। সেখানে তোমার কত কাজ। এক যুগ ধরে তুমি সেবা করেছ বাবার। এইবার করবে সমাজের। তুমি হবে নিবে-দিতা। দিস ইজ নট ইওর প্লেস, মা। তুমি এখন বন্ধনমুক্ত, তোমার সামনে নবদিগন্ত।'

'আমি একবার শঙ্করদার সঙ্গে পরামর্শ করে নি।'

ভবতোষ বললেন, 'কোনও দরকার নেই মা, আমরা ছাড়া, তোমার কে আছে? রোমানস্ রোমানস্, জীবন—জীবন। তোমার ব্যাগে সামান্য কিছু ভরে নাও, ভ্যালুয়েবলস্। পরে সব লরিতে যাবে। তোমার ফিউচারের একটা সমাধান করতে পেরে আজ আমার ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেল।'

'আমি শঙ্করদার সঙ্গে একথার কথা বলব।'

'না, করুণাকেতনের মেয়ে হয়ে তুমি কোনও ফিল্মি নাটক করতে পারবে না। তুমি আর দেরি কোরো না। ওদিকে মানস বেচারা রাইটার্স বিল্ডিং-এর সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে।'

'আমি যদি না যাই?'

রাধুকাকা বললেন, 'তোমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার হবে। আমার স্বপ্ন ভেঙে যাবে। তোমার পিতা দুঃখ পাবেন,আমরা ঠিক করেছিলুম, আমাদের দুজনের যদি ছেলে আর মেয়ে হয় তাহলে তাদের বিয়ে হবে। আমার ছেলে মানস এক-আর-সি-এস।'

রাধুকাকা বললেন, 'এতে হবে কি তুমি তোমার সম্পত্তি ফিরে পেলে। প্লাস পেলে আধুনিক এক নার্সিং হোম। যে হোমের নাম হবে করুণাকেতন। মামলা লড়ে যা তুমি কোন দিন পাবে না।'

'কাকাবাবু, ক'লাখ?'

'ক'লাখ মানে?'

'রাধুকাকু ক'লাখ খাইয়েছেন আপনাকে?'

দুই প্রবীণের চোখ-মুখ লাল হয়ে গেল। হড়াস করে দরজা খুলে গেল। দু'জনে ছিটকে বেরিয়ে এলেন। শঙ্কর আর তার মা চা-জল খাবার নিয়ে আসছিলেন। ছিটকে পড়ে গেল। ভবতোষ ঝড়ের বেগে বেরিয়ে যেতে যেতে বললেন, 'ব্রহ্মচারীর বিয়ে করা উচিত নয়।'

আরতি একটু গলা চড়িয়ে বললে, 'চোদ্দ বছর যখন একা চলতে পেরেছি, বাকি জীবনটাও পারবো।'

প্রযোজক বললেন, 'সেই পাঁচশো টাকা আছে, না খরচ হয়ে গেছে?'

'চলেনি, সব কটা অচল।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, ওটাই আমাদের হাতের পাঁচ, হাতের প্যাঁচও বলতে পারেন। দিন। আবার আর এক জায়গায় গিয়ে টোপ ফেলি।'

বিকট শব্দ করে গাড়িটা চলে গেল। আমার নিয়তির অট্টহাসি।